নজরুল কাব্য বিদ্রোহী:
শতবর্ষে অমলিন

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: শতবর্ষে অমলিন

আল রুহী

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী:
শতবর্ষে অমলিন
আল রুহী
মোবা: ০১৭১২-৮৭১২৪৫
প্রকাশকাল * মে-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ* তারুণ্য তাওহীদ
বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৪০০/- (চারশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৭-৯৯৩৩৩-২-৮
ISBN: 978-987-99333-2-8

Nazrul Kabba Bidrohi: Shotaborshay Omolin By Al Ruhi, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: May-2025; Copy Right:Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer; Price: 400/- (Four Hundred Taka Only); ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

টাঙ্গাইলের তিন প্রথিতযশা সাংবাদিক
জনাব আতাউর রহমান আজাদ
জনাব জাফর আহমদ
জনাব কাজী জাকেরুল মওলা।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জাতীয়তাবোধ, স্বদেশ চেতনা ও ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবন তাকে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। পরাধীন জীবনের গ্লানি জ্বালা তাকে বৃশ্চিক মম দহন করেছে। তার সাহিত্য চর্চার মূল শেকড় বলতে হবে শোষণ বঞ্চনা আর উপমহাদেশের পরাধীনতা। শোষণ বঞ্চনার আবার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে: রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মীয় শোষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রভৃতি। নজরুলের অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, সাম্যবাদী, পূবের হাওয়া এ সকল কাব্য গ্রন্থে সামন্তবাদী সমাজের শোষণের চিত্র নানাভাবে ফুটে উঠেছে। তবে, সমাজের নীচু তলার শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবনের দুঃখ,কষ্ট, দরিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির আকুল আকুতি ঝরে পড়েছে তাঁর কাব্যে। নজরুল মূলত রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি, স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ তাকে আহত করেছে বার বার। তিনি যে সুখী সুন্দর মানবতা বোধের সমাজ, একটি সমতাভিত্তিক সমাজ, একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ, মানুষে মানুষে মিলন ভেদাভেদ শূন্য এক সম্প্রীতির সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন; তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শোষণ জুলুম নির্যাতনের ফলে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তার স্বদেশ চেতনা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা যেমন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছেন, তেমনি তার পুন বাস্তবায়নে তিনি হয়ে উঠলেন এক অদম্য দুর্দমনীয় মহা বিদ্রোহী। যে রোমান্টিক স্বপ্ন পিয়াসী কবি, তিনি হয়ে উঠলেন পরাবাস্তববাদী সমাজ বিপ্লবী: তিনি বলে উঠলেন,

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

যার মানে হলো তার এই বিদ্রোহ সর্বকালের সর্বযুগের সার্বজনীন সকল দেশের সর্বহারা গণ মানুষের, শ্রমজীবী অসহায় মানুষের। সমাজ নানাভাবে পরিবর্তিত রূপ নিবে সত্য; কিন্তু শোষক শ্রেণির শোষণের রূপ একই থাকবে না; তারা পরিবর্তিত রূপেই শোষণ প্রক্রিয়া চালাবে- যার নাম সামাজিক বাস্তবতা পুঁজিবাদী শোষণ এখানে আর দেশ দখলের প্রয়োজন পড়বে না। শুধু দেশের অর্থনীতি দখল করতে পারলেই হলো। নজরুল তাই আর্থসামাজিক অর্থনৈতিক শোষণের এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। ধর্মের নামে যে মৌলতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, যাজকতন্ত্র তিনি তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি বিংশ শতাব্দী কবিতায় বলেন,

‘কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিম নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকী পেশা
ভাঙ্গি মন্দির ভাঙ্গি মসজিদ
ভাঙ্গিয়া গীর্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্ত মেশা
কে শুনিবে আর
ভজনালয়ের হ্রেষা।’
(বিংশ শতাব্দী, প্রলয় শিখা)

তিনি ধর্মের নামে যা খুশিকে অন্ধত্ব গোঁড়ামী কুসংস্কার ধর্ম বলে চালিয়ে মানুষকে শোষণ করার পেশাকে ধ্বংস করার কথা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করেছেন। নজরুল ধর্মের নামের আফিমকে বর্জন করে, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন গভীর এক বিশ্বাসে। এখানে তার বিশ্বজনীন জাতি সত্তার যা বিশ্ব মানবতাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। নজরুল বিদ্রোহী কবির খ্যাতি অর্জন করেছেন শুধু বিদ্রোহী কবিতা লেখার জন্যই নয়। পরাধীনতা, সামাজিক গোঁড়ামী, ধর্মের নামে রক্ষণশীলতা, সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, সামাজিক অসাম্য সর্বোপরি অর্থনৈতিক, শোষণ মুক্ত একটি সমাজের জন্য তার বিদ্রোহ। তিনি প্রগতিশীল একটি রাজনৈতিক চেতনার অভিসারী হয়ে রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামী অংশগ্রহণ করেন। তার সকল কবিতা মানে এই রাজনৈতিক চেতনা ও ধর্মীয় চেতনা সমানভাবে প্রবহমান। তিনি ধর্মের নামে রক্ষণশীলতা বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই তার পুত্রদের নাম কৃষ্ণ মোহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ কাজী রেখেছিলেন।

তবুও কেউ কেউ তাঁকে প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে সন্দেহের চোখে দেখেন; যা আদৌ ঠিক নয়। আসলে প্রগতিশীলতার ধারণাও যুগে যুগে পাল্টে যায়। আজকে যাকে প্রগতিশীলতা বলবো, কালকেই তা আবার রক্ষণশীল হয়ে যাবে। কারণ সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, এটি চলমান প্রক্রিয়া একটি কাজেই নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা স্বদেশ প্রেম ও গভীর জাতীয়তাবোধ থেকে উৎসারিত। নজরুলের সাহিত্য থেকে আবির্ভাব ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাকে সংগ্রামী ও বিপ্লবী করে তুলেছে। বিশের দশকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম অসহযোগ আন্দোলন সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে কবি সমালোচক নজরুল গবেষক আব্দুল কাদির বলেন,

‘কুহেলিকা উপন্যাসখানি নজরুলের সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত। যে যুগে তার সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা রাজনৈতিক চিন্তা দর্শন রূপে প্রবলতম প্রেরণা সঞ্চার করেছে (নজরুল রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ভূমিকা)। বস্তুত খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে নিরুত্তাপ সমাজ জীবনে নজরুল সঞ্চারিত করেছেন নতুন আবেগ অনুভূতি ও উত্তাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতা ও কুহেলিকা উপন্যাস রচনার পূর্বে তার খেয়াপারের তরণী, কামাল পাশা, আনোয়ার

পাশা, মহররম, কোরবানী, শাতিল আরব, ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম, খালেদ প্রভৃতি কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। চিত্ত যে সকল কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক রূপক প্রতীকের ব্যবহার রূপরীতির স্বাতন্ত্র্যে স্বকীয়তায় নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মূলত স্বদেশের স্বাধীনতা চেতনা শৌর্য বীর্যে ও সংগ্রামী তাকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। শুধু তাই নয়, **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর রুশ বিপ্লব তাকে সাম্যবাদী চিন্তাদর্শনে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। ফলে সাম্যবাদী আদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ, বিপ্লবী এমএন রায়, বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্র বসু নেতাজী চিত্তরঞ্জন দাশ তার প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। স্কুল জীবনেই তার প্রিয় শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। বিশ্বের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সামন্তবাদ পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণির হাত থেকে বাঁচতে ও দেশবাসীকে বাঁচাতে রাশিয়ার **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দের সমাজ বিপ্লবকেই তিনি সঠিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করতে থাকেন।

নজরুল জীবন বৈচিত্র্যে ভরা জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি শিল্পের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তার সাহিত্যের মালমশলার কারখানা। কৈশোরে লেটোদলে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন, গ্রাম, বন্দর, শহর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যময় রচনা ও বিপুল সৃষ্টি সম্ভার জুড়েই শুধু মানুষ তার জয়গানে মুখরিত, বিশ্ব মানবতাবাদই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই তিনি কখনোই আপোষ করেননি। সমাজ, স্বদেশের ব্রিটিশ শাসকের সাথে অন্ধত্ব গোঁড়ামীর সাথে যা কিছু অন্যায় অবিচার যা মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার বিরুদ্ধে। মূলত নজরুলের সৃষ্টি রচনাবলী গভীর জীবনবোধ তাড়িত। মানব কল্যাণ প্রয়াসী স্বপ্ন তাড়িত, স্বপ্ন ভাঙাজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ তাকে আহত করেছে বলেই, তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন অদম্য বিপ্লবী। গণমানুষের জন্য, দেশের জন্য, গণমানুষের মুক্তির জন্য করেছেন বিদ্রোহ, লিখেছেন অমর কবিতাখানি, বিদ্রোহী। যা বিশ্ব সাহিত্যের শতবর্ষের এক অনন্য সংযোজন এক চেতনা সঞ্চারী জ্বালাময়ী অনিন্দ্য কাব্য। যার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। আমার প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নজরুল কাব্য বিদ্রোহীঃ শত বর্ষে অমলিন' গ্রন্থে বিদ্রোহী কবিতাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছি। যদিও কাজটি কঠিন জটিল দুরূহ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তবুও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সাহিত্য অভিজ্ঞতায় যদি কোনো সুহৃদয় পাঠকের কোন ভুল ত্রুটি চোখে পড়ে তবে ধরিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞচিত্তে শোধন করার আশা রাখছি।

বিনয়াবনত
আল রুহী

সূচি

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: উৎসের সন্ধান ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ভাব ভাষা ও ছন্দ ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: বিপ্লববাদ ও প্রেমবাদের সমন্বয় ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: মীথের অপূর্ব ব্যবহার ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: বিশ্বের নিপীড়িত
গণ-মানুষের মুক্তির মহাকাব্য ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ব্যক্তিত্ববাদের চরম উল্লাস ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ওমর খৈয়ামের প্রভাব ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: আধ্যাত্মিক দর্শন ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: সকল যুগে প্রাসঙ্গিক ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: শতবর্ষে অমলিন ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: বিশ্ব সাহিত্য ❑ ১১
নজরুলকাব্য বিদ্রোহী: নজরুল মানস ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে ❑ ১১
নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনা ❑ ১১

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: উৎসের সন্ধান

একথা স্বীকার করিতেই হবে, নজরুল কাব্য বিদ্রোহী রচনার উৎস রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন শোষণের ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতের গণ মানুষের নিপীড়নের যে ভয়াবহতা সমকালীন কবি সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সচেতন মহলের জানা থাকলেও তারা উত্তাপহীন সামাজিক জীবন যাপন করছিলেন। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যে প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে জ্বলজ্বল করছিলেন। সমকালীন আবহ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ তাকে বেশি আন্দোলিত করার কথা। কিন্তু তিনি ছিলেন অনেকটাই নির্বিকার। তবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তার নাইট উপাধি বর্জন করেন ও লাট সাহেবকে চিঠি পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদ বলতে এতটুকুই তখন তার কাছে দেশ জাতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এরা অনেক কিছু আশা করেছিলেন; কিন্তু কবিগুরু জাতিকে হতাশা করেছিলেন যা কারো কাম্য ছিলো না।

বিদ্রোহী কবিতার উৎস সন্ধান করতে গেলে একটি কথা বলতেই হবে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার মিথ্যা ভণ্ডামী ধর্মের নামে উচ্ছৃঙ্খল অন্ধত্ব গোঁড়ামী কূপমণ্ডুকতা, ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ চিরন্তন মানবাত্মার উত্থান কামনাই মূল উদ্দেশ্য অসচেতনতা বা আত্মজাগরণও কেউ কেউ বলতে পারেন।

নজরুলের ডাকনাম যে নুরু তা সকলেই জানেন। আর নুরু চরিত্রের মধ্য দিয়ে নজরুলের সাহসিকতা ও বিদ্রোহী মানসচেতনা ফুটে উঠেছে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্রোহী কবিতা লিখবার অনেক পূর্বেই বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ তার জীবনে ঘটেছে। অনেকে মনে করেন নজরুল কবি মোহিত লাল মজুমদারের 'আমি' কথিকা পড়ে বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেছেন। তবে মোহিত লাল মজুমদারের এই দাবী অনেকটাই ঠুনকো। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন, প্রসঙ্গত কবি মোহিত লাল মজুমদারের তাকে অনেকে উঠিয়ে দিয়েছেন একেবারেই। কিন্তু কবি মানসের যে পর্যায়টিকে বলা যায় প্রেরণার উৎসভূমি সেই প্রেরণা দেশে মোহিত লালের কবিতাটি নজরুলের বিদ্রোহী ফলাতে সহায়তা করেছিল এতে আমি কোন সন্দেহ দেখি না। নিশ্চয়ই মোহিত লালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আলাদা হয়ে গেছে। তবুও প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীর জন্য নজরুলের মানসজমি তৈরি করেছে ঐ রচনাটি। (দ্রষ্টব্য বিদ্রোহী: এক ভাষা-ইত্তেফাক-১৮ ভাদ্র, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।)

নজরুলের সাহসিকতার সুদীর্ঘ পথ তার গদ্য বিদ্রোহী মিলিয়ে পড়লে এটাই স্বাভাবিক মনে হবে যে, তার গদ্যই বিদ্রোহীর উৎস। নজরুলের কবিত্ব শক্তি। ভাব ভাষা ছন্দ রচনা নৈপুণ্য আর বিদ্রোহীর মানস চেতনার আদি উৎসভূমি কোথায়। নজরুলের কবিতা গান নিয়ে যত আলোচনা সমালোচনা হয় কিন্তু তার গদ্য বিশেষত গল্প উপন্যাস নিয়ে এতটা আলোচনা হয় না। অথচ নজরুলের কবিতায় ভাবনা চিন্তা আবেগ অনুভূতি স্বপ্ন কল্প, বক্তব্য প্রকাশ, ভাব ভাষা উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প তার গদ্য রচনা থেকেও এসেছে কম নয়। গদ্য রচনার অনেক কথাই তিনি তাঁর কাব্যের বহুক্ষেত্রে পরবর্তীকালে রূপায়িত করেছেন। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর আদি পটভূমির কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে নজরুল বিদ্রোহীর পূর্বেই তার বিখ্যাত কবিতাগুলো রচনা করেছেন; মহররম, খেয়াপাড়ের তরণী, কোরবানী, সিন্ধু, রীফ সর্দার, আনোয়ার, কামাল পাশা, উমর ফারুক, খালেদ, ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম, শাতিল আরব প্রভৃতি। কাজেই বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব রবীন্দ্র যুগে কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তার খ্যাতি ও পরিচিতি তার স্বাতন্ত্র্যের এক স্বাক্ষর। সমালোচকগণ এ কারণেই বলেন: কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরুবার ইচ্ছেটাকে মনে হতো যেন রাজদ্রোহের শামিল, আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্ত্র ভরা নেশা, তার বেলোয়ারী আশুয়ারের যাদু- অত্র আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো, বাংলা কবিতার; অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো। (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক সাহিত্য চর্চা ১৪৪-৪৫পৃ.।) নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন পূর্বেই কিন্তু তার দিগ বিজয়ী প্রবল প্রতাপ বিদ্রোহী রচনার কালেই ঘোষিত হলো, এর ফলেই সমকালীন কবি সাহিত্যিক এমন কি বাঙালি পাঠক সমাজে রবীন্দ্রনাথের সম্মোহনীর যে ঝিমুনী তা কেটে নতুন রূপে নতুন আবেগে নতুন আশায় জেগে উঠে। বাংলা কাব্যে বিদ্রোহী নতুন ভাব ভাষা ছন্দ ও নতুনত্বে স্বকীয়তায় আলাদা সত্তা যোগ করে। কবিতাটি ব্যাপক পঠিত ও সুধীমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে কবি ও সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন, 'মাত্র দুবছর আগে যিনি লেখক মহলে দেখা দিয়েছেন সেই বাইশ বছরের তরুণ কবির হাতে বিদ্রোহীর মত প্রাণবন্ত কবিতা বের হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার।' রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ; শ্রবণে পাঠকের আসে বেগবতী স্রোতস্বিনীর উপলব্ধিত কলধ্বনি। কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহীতে রূপায়িত হয়েছে উদ্দাম প্রাণশক্তি, অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাস। সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিদ্রোহী প্রথমে সাপ্তাহিক বিজলীতে পরে অর্ধসাপ্তাহিক ধুমকেতুতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মোসলেম ভারত, প্রবাসী, বসুমতি, সাধনাসহ প্রায় শখানেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বোধন, ইসলাম প্রভৃতি পত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা এবং সকল মহলে বিপুল আলোচনার সৃষ্টি করে। কবি শৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক বিদ্রোহীর ছন্দে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মুসলেম ভারতে বিদ্রোহী বীর নামে সুদীর্ঘ কবিতা লিখে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীর বিপরীত মেরু থেকে কবি গোলাম মোস্তফা ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায় সওগাতে সেই ছন্দেই লেখেন নিয়মিত। (নজরুল পরিচিতি-পৃ.১০-১০)। বিদ্রোহী

ব্যাপক আলোড়ন ও আলোচনার ঝড় তুলেছিলো সত্য, কিন্তু নজরুল তার বিদ্রোহীতে ভাবে, ভাষায় ছন্দে আবেগে নতুন মাত্রার কবিতা লিখে পাঠক-সমালোচক ও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তা বিদ্রোহী রচনারও অনেক আগেই। বিদ্রোহীর প্রকাশ ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ অন্যদিকে কবির শাতিল আরব ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মোসলেম ভারতে, কোরবানী ১৩২৭ সালের ভাদ্র। নজরুলকে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দন প্রকাশ করেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার লিখলেন 'মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে। তাহার প্রতিভা যে সুন্দরী শক্তিশালিনী এক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাহার ভাব, ভাষা, ছন্দ। আমি এই অবসরে তাহাকে বাংলার স্বারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙালি পাঠকগুলোকে সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাংলার কবি মালঞ্চেও আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম লাগিয়াছে। মলয় সমিরণের অভাবে ব্যঞ্জনী বিজন চলিয়াছে। বাংলা কাব্য লক্ষ্মীর ভূষণ সিঞ্চন, তাহার এটিই লাঞ্ছনা নৃত্য ও লীলা ও নূপুর নিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন কৃত্রিম আওয়াজ নিয়ম শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ মানব কণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবন উল্লাস সময় বৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য কাব্যরসময় বঞ্চিত অসার অপদার্থ কবি যশ প্রার্থির ঝিল্লি সুরে বাংলা কাব্য কাল সন্ধ্যায় অবসাদ নির্জনতা সূচিত হইয়াছে। আপনার পত্রিকাতে হিন্দু কবির ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের দুইটি কবিতা (অন্যগুলো পড়িবার সুযোগ হয় নাই।) পড়িলাম তাহা দ্বারা মুসলেম এবং ভারত গৌরব রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে।'

তিনি আরো বলেন,

'কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম ভুলিব? বাংলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝংকার বর্ণনা বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় আলোড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যা রাজনীতির উপর বিরক্ত হইয়াছি। কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝংকারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থময়ী কাব্য ভারতীয় ভূষণ না হইয়া প্রাণের আকুতি ও স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানিং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারা চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাহার হৃদয় নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানব কণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাহার স্বতঃউৎসারিত ভাব কল্লোলনীর অবশ্যম্ভাবী বাচনভঙ্গী খেয়াপাড়ের তরণী কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাব অনুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে। ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বাধীন স্ফূর্তি অবলীলায় অবাধ আবেগ কবি তাহাকে কোথাও হারাইয়া বসেন নাই। ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে। কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। আর এই কবিত্ব শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয় ভক্তি সাহস অটল বিশ্বাস এবং সর্বপরি হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকার মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃতি করিব কবির:

'আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দার
দাঁড়ি এ যে তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি মুখে সারি গান লা শারীক আল্লাহ।'
(খেয়াপারে তরণী)

এই শ্লোকে মিল ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গাম্ভীর্য ধ্বনি আকাশে বাতাসে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয় ডমরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে। বিশেষত এর শেষ ছত্রের শেষ বাক্যাংশ লা শরীক আল্লাহ যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবীবাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে। মোহিত লালের চিঠি থেকে সম্পাদকে (মোসলেম ভারত) নজরুলের কবিতায় ভাব, ভাষায় ছন্দে ও প্রকাশভঙ্গীতে এক নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো বিদ্রোহী রচনার আগেই। বিদ্রোহী রচনা নিয়ে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তার কালের পুতুল গ্রন্থের নজরুল ইসলাম নামে রচনায় লিখেছেন,

'বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করেছিলো এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সাথে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন এবং তার কাছে কি ভাগ্য! কি বিস্ময়! একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেক কবিতা। নোয়াখালীর রাক্ষুসী নদীর আগাছা কণ্টকাকীর্ণ কর্দমাক্ত নদী তীরে বসে সেই খাতাখানায় আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন, ছিলো কামাল পাশা, আর কি ছিলো মনে পড়ছে না। সেসব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো। আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলো'। (কালের পুতুল-নজরুল ইসলাম পৃ. ২৫)

বিদ্রোহী প্রকাশের আগেই নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র পাঠান কবি মোহিত লাল মজুমদার। আর অগ্নিবীণা প্রকাশের সাথে সাথেই এ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুলকে যুগপ্রবর্তক কবি হিসেবে অভিহিত করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন

'অতীতদিনের স্মৃতি'-গ্রন্থে বলেন; 'এর কিছুদিন পরে নজরুলের প্রথম গ্রন্থে অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। নজরুল মোসলেম ভারতে সমালোচনার জন্য এক কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। অগ্নিবীণার সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিল। কাজেই মোসলেম ভারতে সঙ্গে সঙ্গেই দুই কলামব্যাপি এর সমালোচনা বেরুলো। অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম সমালোচনা ছিল এটাই। এর পরের সপ্তাহে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত বিজলীতেও এর দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। মুসলেম ভারতের সমালোচনায় নজরুলকে যুগপ্রবর্তক কবি বলে অভিহিত করেছিলাম। বলেছিলাম, আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই তৃতীয় যুগপ্রবর্তক কবি।' (অতীত দিনের স্মৃতি-আবুল কালাম শামসুদ্দীন)

আধুনিক বাংলা কবিতায় নজরুলের শক্তিমত্তার পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর বিদ্রোহী কবিতা রচনার পূর্বেই। বাংলা কাব্যে এই যে, তার মৌলিকত্ব, নিজস্বতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং তৃতীয় ধারার যোজনা করলেন, তা ভাবভাষা ছন্দ রুপক প্রতীকের ব্যবহারেই নয় মহৎ মানব আত্মার মুক্তির চেতনায় উৎসর্গীকৃত এক চিরন্তন মানব জাগরণের উৎস হিসেবে তার বিদ্রোহীর উৎস সন্ধান করতে গেলে তার কবি মানসের নিগূঢ় স্বরূপ খুঁজতে হবে। সেই সাথে বৃহৎ সমাজ ভাবনা সমকালীন রাজনৈতিক চিত্র ও সর্বোপরি মানব মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

বাংলা গীতি কবিতায় নজরুল যেমন স্বকীয়তায় নিজস্বতায় মুক্তির দ্বার উন্মোচন করেছেন; তেমনি তার মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে মানব জাগরণ তথা বিদ্রোহী স্বরূপের চৈতন্যের মাঝেই। নজরুলের পূর্বেই বাংলা গজল গান ফার্সি আঙ্গিকে কবি মোহিত লাল মুজমদার রচনা করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভারে বাংলা গীতিকাব্যের রুদ্রবীণায় নজরুল ইসলাম সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন অভিনন্দিত হয়েছেন। সমসাময়িক কালে শুধু তার বিদ্রোহী সত্তার ফলেই রবীন্দ্র সমকালে জন্ম নিয়েই তিনি কালজয়ী মহৎ প্রতিভার স্বীকৃতি লাভে সম্মত হয়েছিলেন। কেউ বলেন, ফার্সি গজলের শরণাপন্ন না হলে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন। প্রযুক্তি নিছক অর্থহীন এক অনুমান সাপেক্ষ মন্তব্য মাত্র। (বুদ্ধদেব বসু)

বস্তুত বিদ্রোহী কবিতার উৎসের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে বিশ্বের ভাঙা গড়া উথান পতন শোষণ শোষিতের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানব মুক্তির যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা শ্রেণিহীন এক সাম্যবাদী সমাজ বাস্তবতার যে স্বপ্ন তা রোমান্টিক কবির কবিতা গান ও সাহিত্য কর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে। নজরুল কাব্যে বিশেষত বিদ্রোহীতে ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষার বৈচিত্র্যে সর্বোপরি মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের যেমন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তেমনি হিন্দু মীথের অবাধ ব্যবহার। ভাব ভাষা ও রূপক প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। বিদ্রোহী কবিতার উভয় জাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয়, বহুমুখিতা, গভীরতা এবং অনুপম সৌন্দর্য চেতনার স্বরূপ। নজরুল ভিন্নমুখী বিপরীতমুখী ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে উপমাপ্রতীক উপাদান আহরণ করে তার কাব্য জগতের মিনার গড়ে তুলেছেন। সে জগত হয়েছে রূপ সৌন্দর্যে মনোহর, কল্পনা প্রতিভায় স্পর্শে প্রাণাবেগে স্পন্দিত ও সজীব। এ কথা সত্য যে নজরুল কাব্য জগত ও ব্যক্তিগত সত্তার এক অপূর্ব মেলবন্ধন বিদ্রোহী কবিতার উৎসভূমি তৈরিতে উপাদান যুগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই বিশ্ব সাহিত্যেও এর তুলনা বিরল ঐশ্বর্যে মণ্ডিত।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী রূপচেতনার অধিকারী নজরুল, মূলত রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি। স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ তাঁকে তাড়িত ও আহত এবং বিক্ষুব্ধ করেছে। প্রেম প্রকৃতি ও নিসর্গের রূপ বর্ণনায় তিনি ছিলেন আত্মনিমগ্ন। কিন্তু সমকালীন সমাজ, বাস্তবতা ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ নিপীড়ন সর্বোপরি পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে শতত প্রাণিত করেছে স্বদেশ চেতনায়। স্বদেশের গ্লানি আর চিরন্তন মানবাত্মার অপমান তিনি সইতে পারেন নি। কাজেই প্রেম প্রকৃতির কবি হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে নজরুল বিদ্রোহী চেতনার অনন্য রূপকার হলেন তার উৎসের সন্ধান করতে হলে আগে তার জীবন চেতনা সাহিত্যের আদিরূপ তার গদ্য সাহিত্যের স্বরূপ খুঁজতে হবে। তবে তার পত্রপোন্যাস বাঁধনহারার নুরু চরিত্রেই যে বিদ্রোহীর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। এ বিদ্রোহীর মানস গঠনে, পত্রপোন্যাসে বাঁধন হারার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্রোহী রচনার উৎস দার্শনিক ভিত্তি যাই থাক। মানসিক ভিত্তি যে তার দেশের মানুষ উপন্যাসের চরিত্র ও সমকালীন সমাজ, রাষ্ট্রে কাঠামো তাতে সন্দেহ নাই। কবির মানস ভূমির রূপায়ন ঘটেছে কবিতায়। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর উৎস ভূমি চিরন্তন মানবাত্মার মুক্তির সাথে সাথে সাম্যবাদী একটি সমাজ কাঠামোর ধারণা নিহিত রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ভাব ভাষা ও ছন্দ

একটি কবিতা লিখতে কবি ভাব ভাষা ও ছন্দ এবং উপমা রূপক প্রতীক ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করে থাকেন। আর তার অসামান্য কল্পনাশক্তি তাকে আকর্ষণীয় নান্দনিক রূপদান করে। কবিতায় শুধু শব্দ দিয়ে কবিতা প্রমাণ করা যায় না। এতে ভাব ও বক্তব্য একটি চিত্রকল্পের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে। কবিতা নির্মাণের কোন ভাব ও বক্তব্য যেমন থাকবে, তেমনি রূপের মহিমা থাকবে। যা কবির কবি মানস ও সৃজনশীলতার উপরই নির্ভর করবে। কবির ভাবনা প্রকাশে ভাব, ভাষা, ছন্দের ব্যবহার থাকবে, কবি তার সাধ্যমত উপমা প্রতীক ব্যবহার করবেন কিন্তু কবিতা সৃজনে কিছু যাদুময় শব্দ শক্তি ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। অনেকেই অধিক পরিমাণ উপমা প্রতীক ব্যবহার করেন কিন্তু সবার পক্ষেই সত্যিকার প্রাণ মাতানো কাব্য শিল্প রচনা সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ শব্দ ছন্দ উপমা প্রতীক উৎপ্রেক্ষা কোনটিই কবিতা রচনার এককভাবে বা আলাদাভাবে কবিতা নয়। কবিতার উপাদান মাত্র।

কবিতা মূলত এসবের একটি মহিমান্বিত অভিনব শিল্পরূপ।

কোন ধ্বনি নয়; অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ কবিতার অভিব্যক্তির মাধ্যম। কাজেই শুধু শব্দ নয়; শব্দ সমবায় রূপই কবিতার অপরিহার্য শর্ত। একটি শব্দ পুনপৌনিক উচ্চারণের মাধ্যমে আবহ সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও বিচিত্র ভাব প্রকাশে শব্দ ও ধ্বনির বৈচিত্র্যময়তা প্রয়োজন। শব্দ ও ধ্বনির বৈচিত্র্যময়তা ভাষার আশ্রয়ে শব্দের অনুষঙ্গ লাভ করে। এর ফলে শব্দের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে ভাষার আলোচনা এক অনিবার্য রূপ লাভ করে। সাধারণত ভাষা অর্থে মানুষ দৈনন্দিন মনের ভাব প্রকাশে মনোভাব জ্ঞাপনে যে আদান প্রদান করেন তাই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কবিতার যে ভাষার প্রসঙ্গ তা প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষা নয়; বরং অব্যবহৃত ব্যবহৃত কৃত্রিম অকৃত্রিম-সচল-অচল-আভিধানিক-আটপৌরে সব কিছুই এর আওতাভূক্ত। কারণ কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা প্রচলিত জীবনাশ্রয়ী ভাষা নয়; বরং মৃত ভাষার শব্দ ব্যবহার হইতে পারে, আবার অভিধানের আশ্রয়ও নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শব্দাশ্রয়ী ভাষা আশ্রয়ী না হতে পারেন। কবি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে শব্দরাজিকে সচল জীবনের যে ভাষা তার অনুষঙ্গ করতে পারেন এতে ভাব সৃষ্টির নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন কবিতা বা সাহিত্যে শিল্পের ভাষা যতটাই জীবন ঘনিষ্ঠ হোক না কেন প্রতিদিনের জীবন যাপনের ভাষা নয়; কিছুটা হলেও কৃত্রিম। আর এই কৃত্রিম ভাষার কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টিতে কবি বা সাহিত্য শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষা ব্যবহারে কায়দা কৌশল নিয়ম মাফিক হলেও তা নবরূপে বিন্যস্ত ও বিস্তৃত হতে পারে। নতুন চিন্তা চেতনা বিদেশি ভাষার ব্যবহার ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রয়োগ নিজস্ব ভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে থাকে। নতুন কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভাষার সমৃদ্ধির পাশাপাশি সেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। যুগে যুগে একই শব্দ কবিতায় বিভিন্ন রূপে ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন মহিমা ও গৌরব নিয়ে হাজির হয়ে থাকে। কবিদের প্রতিভা ও ভাষার ব্যবহার নৈপুণ্যে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাতে একই শব্দ অর্থ ও মহিমা গৌরব রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কবিতায় আনন্দ পরিবেশ রূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি পাঠকের সুপ্ত চেতনার জাগরণ ঘটানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও কবিতা নিছক জ্ঞানের বারতা প্রকাশ করে বারংবার সৌন্দর্যের পথেই তাঁর যাত্রা। আর সে কারণেই কবিতার শিল্পময়তার পথে ধাবিত হওয়া অন্যতম শর্ত। শিল্পময় হয়ে উঠার পক্ষে শব্দ ও ভাষার সমন্বয়ে ছন্দ ও ধ্বনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর ছন্দ ও ধ্বনি ভাষার আশ্রয়েই বেজে উঠে সৃষ্টি করে সুর প্রবাহ।

কবিতার ভাষা বিচার ও বিশ্লেষণে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কবির শব্দ আহরণ ও ব্যবহার এবং বাক্য বিন্যাসের বিশেষরীতি ভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিদান কবির শব্দ চয়ন বিশেষ ব্যবহারের মূলে কাজ করে তার ভাব স্মৃতি, শ্রুতি অভিজ্ঞতা ইতিহাস ঐতিহ্যবোধ ও কাল চেতনা। ভাষা ব্যবহারেও নজরুলের বিদ্রোহী মানস চেতনা কাজ করেছে। নজরুল সাহিত্যের বিশেষত তার ভাষা শিল্প ও ছন্দ সম্পর্কে বলা যায় তিনি শুধু ভাষা এক ছন্দকার কবিই নন; তার রচনায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ভাষার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রয়েছে। তিনি বিচিত্র ধরনের ভাষা ব্যবহার করে এক স্বতন্ত্র কাব্য ভাষার জন্ম দিয়েছেন। নজরুলের কবিতার ভাষা ও শিল্পরূপের পরিচয় দিতে গেলে তার কৈশোরকালে কাব্য রীতির বাক্য চয়ন বর্ণনাভঙ্গি পরবর্তী কাব্য সাধনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ নজরুল তার কাব্য রচনায় উপজীব্য বিষয় যেমন জীবন ও জগত থেকে আহরণ করেছেন; তেমনি তা প্রকাশের ভাষার আদলেও তিনি সংগ্রহ করেছেন বৃহত্তর সমাজজীবন ও পরিবেশ থেকে। রচনার উপজীব্য বিষয় প্রকৃতি অনুসারে নজরুলের কবিতাগানের ভাষার ব্যবহার, কৌশল, রীতি পদ্ধতি পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ একজন সৃজনশীল মৌলিক কবি ইতিহাস ঐতিহ্যের রূপকার হিসেবে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে কবিতার শব্দ চয়ন রীতি ভঙ্গির সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। শব্দের সাথে ভাবের যে সংযোগ যদি সাযুজ্য না থাকে তবে কবিতার প্রাণ সঞ্চালিত হবে না। কবিতায় শব্দের সাথে ভাবের মিশ্রণে নজরুল কোন সংকীর্ণতার স্থান দেননি। তিনি যথার্থ অনুধাবন করেন যে, ভাষার যেমন একটি গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে তেমনি ভাষার অন্তর্গত শব্দাবলীতেও রয়েছে, অনির্বাণ নিশানা সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। যে ভাষায় কবি লিখবেন সে ভাষার একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ভাষার অধিকারী জনসমাজ তার ঐতিহ্য প্রোথিত। যদিও নজরুল ভাষার ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন শাস্ত্রীয় আলোচনা করেননি। তবে তিনি সচেতনভাবে যে ভাষা ব্যবহার শব্দ চয়ন করেছিলেন তা নিঃসংশয় চিত্তে বলা যায়।

নজরুল তার কৈশোরকালে লেটোদলে গান রচনায় শব্দ চয়ন, ভাষা ব্যবহার করতে আমাদের বৃহত্তর সমাজ ভাবনা, লোকাচার ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখেছেন। লেটো দলে গান বাঁধা তা পরিবেশনের সময় বৃহত্তর লোকসমাজের

মনোরঞ্জন ও রাম বিহারের বিষয়টি তাকে মনে রাখতে হয়েছে। কারণ কবি হিসেবে শুধু প্রতিধ্বনি নয়; এখানে তার জীবনধারণ ও জীবিকা অর্জনের বিষয়টিও কাব্য রচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কবি মানসের তাড়নায় বৃহত্তর সমাজ ভাবনার সাথে একাত্মা, সেই সাথে লোক রাজন্যের তাগিদ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কৈশোরের ঐ বাস্তবতা ও সহজাত মানসিকতা পরবর্তী জীবনে কাব্য সাধনায় গভীরভাবে তাড়িত করেছে। নজরুলের কৈশোরকালের লেটো দলে যে গান বাঁধতে শব্দ চয়ন, ভাষা ব্যবহার লোকরীতি ইতিহাস ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা সত্যি আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য অবলম্বনে যে জীবনী মহাকাব্য রচিত হয়েছে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কৈশোরেই নজরুল লোক ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়ে বৃহত্তর সমাজ ভাবনা তাড়িত হয়ে লোক বন্ধন ভিত্তিক একটি বন্দনা গানে বলেন,

'সর্বপ্রথম বন্দনা গাই
তোমারী ওগো বারি তালা
তার পরে দরুদ পড়ি
মোহাম্মদ সাল্লে আলা
সকল পীর দেবতা কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
সালাম জানাই হস্ত তুলে
দোয়া কর তোমরা সবে
হয় যেন গো মুখ উজলা
সর্বপ্রথম বন্দনা গাই
তোমার ওগো খোদাতালা।'

কৈশোরের এই বন্দনা গানে সৃষ্টিধর্মী লোক ঐতিহ্য রয়েছে সত্য; তবে কাব্য গুণের অভাব রয়েছে। তিনি প্রথাগত লোকরীতির আশ্রয়ে একটি বন্দনা গান রচনা করেছেন মাত্র। এতে কবির কাব্যগুণ ও শিল্প মানের প্রভূত অভাব যেমন আছে; তেমনি তার বয়সকালের বিবেচনাও মূল্যায়নের দাবী রাখে। লোক ঐতিহ্যের ধারা বহু প্রাচীনকালের ধারাবাহিক কাব্য রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে।

নজরুলকাব্যের বহু রচনায় হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাষার বিষয়ভিত্তিক ব্যবহার এই রচনায় হিন্দু মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রয়োগ নজরুলের উদার মনের পরিচায়ক। এই রূপ উভয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহারে তিনি মহৎ বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর চেতনাবোধ তাকে তাড়িত করেছে। বিষয় নির্বাচনে তিনি বাঙালি ও মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্য চেতনাকে ভুলে যাননি, আবার যে সামাজিক আবহে তিনি বড় হয়েছেন তাদেরও ভুলে যাননি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ আবার হিন্দু ধর্মের পুরাণের প্রসঙ্গ আসলে নজরুল কাব্যে মানব চেতনারই ঐতিহ্যগত সার্থক রূপায়ন ঘটেছে। শুধু বিষয় নির্বাচন নয়; ভাবে ভাষার শব্দ প্রয়োগ শব্দের বিন্যাস, উপমা, প্রতীক, উৎপ্রেক্ষা নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ বিদ্রোহীতে নতুন এক মাত্রা যোগ হয়েছে। বিদ্রোহীতে নজরুলের শব্দ প্রয়োগ বাণী মূর্তি ভাষার ঐতিহ্য উৎস সন্ধান করতে গেলে বলা যায় ধর্ম কেন্দ্রিক মধ্য যুগের বাংলা কাব্য শুধু যে উপাদানগত দিক থেকে নয়, রচনার আঙ্গিকগত দিক থেকেও গতানুগতিক ছিল। তবে বিদ্রোহীতে নজরুলের ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐশ্চর্যশালিনী হয়েছে। বিদ্রোহীতে নজরুলের শব্দ সম্ভার বাক রীতি ও ছন্দ প্রকরণ বৈশিষ্ট্যগতভাবে সঙ্গে ধারণ করেছে সকলে কাব্য ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধি বাণী মূর্তি ও শিল্প বিচারে সার্থকতা লাভ করেছে। তাই নজরুল কাব্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, কবিতার যে আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্র নাথ লিখেছেন নজরুলও তাই কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তার জীবনের পটভূমিকায় ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন আবার সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমানও আপন করে নিয়েছিলেন। চেষ্টার দ্বারা এর স্বভাবতই। বাল্য কৈশোর কেটেছে শহরে নয়; স্কুল কলেজে ভদ্র লোক হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রা গান বেধে যে গানের আসরে বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তার সৈনিক হয়ে ওঠা। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তার অসুবিধে ছিলো এগুলোই সুবিধে হয়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। (সাহিত্য চর্চা রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক পৃ. ১৪৬)

ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশ ও কাব্য সাধনার স্বাতন্ত্রের মূলে নজরুল জীবনের পটভূমির ভিন্নতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সৃষ্টির থেকে নজরুল জীবনের ভিন্নতায় অনেক বাঁধা প্রদান করেছে। তবে তার সহজাত কবিত্ব শক্তি কোলাহলে গান রচনার এক যাদুকরী ক্ষমতা দিয়েছিল। তার এই ক্ষমতা বলেই তিনি ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারকে নতুন সম্পদে পরিণত করতে পেরেছিলেন, ভাষায় শব্দে ও বিষয়বস্তুতে। অনেক হিন্দু মুসলিম কবি ও ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারকে কাব্যে গানে নতুন ভাবে সাধনার প্রয়াস করেছেন কিন্তু নজরুলের মত সফলতা কজনই বা পেয়েছিলেন। আর এই ঐন্দ্রজালিক সমতার অপর নাম স্বাতন্ত্র্যব্যক্তি প্রতিভা। কবিতার ভাষাকে কীভাবে নজরুল কাব্যময় শিল্পময় করে তুলেছেন সেটিই বিচার্য বিষয়। তার পূর্বে মধ্যযুগে শেষ পাদের মঙ্গলকাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বলেন

'না রবে প্রসাদ গুণ, না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।'

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় শব্দ চয়ন, শব্দের ব্যবহার, শব্দ সম্পর্কিত ঐতিহ্য চেতনা নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীমূলক প্রয়োগ নৈপুণ্য পরিচয় দিতে গিয়ে শহিদ মুনীর চৌধুরী বলেন, 'কাব্যের বহিরঙ্গে নজরুলের কৃতিত্ব আরবি ফার্সি শব্দের অবাধ এবং আকণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুষঙ্গ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। তার কিছু বাঙালি মুসলমানে দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত কিছু জ্ঞানার্জিত শব্দ ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ যথাযথ হয়, ললিত

হয়, ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় যেন পাঠকের মন কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিগত সমারোহ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ নিরপেক্ষ মোহবিস্তারে সমর্থ হয়েছে।' (নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ন- মুনীর চৌধুরী)

নজরুল কাব্য সৃষ্টিতে শিল্পীসুলভ তাগিদে কবিতার যে কোন শব্দ হোক আরবি ফার্সি তৎসম কিংবা দেশজ অর্থ ও ধ্বনি গৌরবের দিক থেকে এবং রূপবানের বিবেচনায় নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কাব্যরস ছাড়া শব্দ চয়ন ও ভাষা ব্যবহার, উপমা উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি প্রসঙ্গে নজরুলের সামাজিক ও শিল্পতাত্ত্বিক বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে আরবী ফার্সি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলেন,

'এই আরবি ফার্সি শব্দ প্রয়োগ শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ করে গেছেন। কিন্তু উতারো কথাটা যে জাতেরই হোক ওতে যে অপূর্ব মার্জিত শ্রী উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায় তাতে কেউ অস্বীকার করবে না।

একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী কথার প্রয়োগ অপূর্ব রূপ ও গতি দেয়ার আনন্দেই আমিও আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবি গুরুও কতদিন আলাপ আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন। 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায় মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। আমি শুধু খুন নয় বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহী আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তার শ্রী হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তী ও ঢঙের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।' নজরুল আরো বলেন,

'বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেওর পরালে তার জাত যায় না। বরং তাকে আরও খুবসুরত দেখায়। আজকের কাব্যলক্ষ্মীর অর্ধেক অলংকারইতো মুসলমান ঢঙের বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবণীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। (বড় পীড়িত বালির বাঁধ নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা ৬২৬-২৭)

বাংলা কবিতায় আরবীয় ইরানী শব্দরাজি এবং অলংকার ব্যবহার করেই নজরুল তার কবিতাকে করে তুলেছিলেন স্বতন্ত্র অভিনব অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর তাই কবি সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার নজরুলকে প্রাণখোলা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তার কবিতার স্বাতন্ত্র্য অভিনবত্ব মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি নজরুলকে বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত জানিয়ে কবি মোহিত লাল লিখেছিলেন,

বাংলা কাব্য লক্ষ্মীর ভূষণ নিরঞ্জন তাহার নটিনী নিত্যলীলা ও নূপুর নিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দ সমষ্টি কৃত্রিম নিয়ম শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ মানব কর্মের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবনোল্লাস স্বর বৈচিত্র্যকে চাপিয়ে রাখিয়াছে, অসংখ্য কাব্য রসমাত্র ব্যবহৃত আমার অপদার্থ কবি যশ প্রতিষ্ঠার ঝিল্লিধ্বনি বাংলা কাব্যে সকাল সন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জীবতা সূচিত হইতেছে।

আপনার পত্রিকার সেই হিন্দু কবির ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (অন্য পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই।) পড়িলাম তাহার দ্বারা মুসলেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে। বাংলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে। লেখক ও পাঠকের মাঝে চিন্তা বিনিময় হইয়াছে। কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম ভুলিব? বাংলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝংকার ও ধ্বনি বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু সর্বশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুজরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝংকারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থময়ী কণ্ঠে ভারতীয় ভূষণ না হইয়া প্রাণের আকুতি ও হৃদয় স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানিং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাহার নীহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানব কণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেব ছন্দ তাহার স্বতঃ উৎসারিত ভাব কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গি। বাদল প্রাতের শরাব কবিতায় ইরানের পুষ্প রস ও দ্রাক্ষারসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতে কবির মস্ত হইবার ও মস্ত করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালি মাত্রেই ইহার রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয় যুক্ত হোক (মুসলেম ভারত- ভাদ্র-১৩২৭)।

নজরুলের ব্যক্তি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং তার যাদুকরি কবিত্ব শক্তির বিচার করতে হলে তার জীবনের বৈচিত্র্যময়তা বিশ্লেষণ করতে হবে। না হলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। রবীন্দ্র প্রভাবিত বাংলা কাব্যে ব্যতিক্রম ও নতুন সুরের প্রবর্তনের পেছনে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার অবদান অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'বিদ্রোহী কবিতার নিশেন উড়িয়েই নজরুল সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলেন।' শুধু বিদ্রোহী নয়; বিদ্রোহী রচনার পূর্বেই তিনি বাংলা কবিতায় ব্যাপক আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে তাঁর নিজস্বতা মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহররম, খেয়া পাড়ের তরণী, খালেদ, উমর ফারুক, শাতিল আরব, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, রীফ সর্দার, ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম। তবে এমন কবিতারও তার ভাষাগত ও ভাবগত বিদ্রোহ বর্তমান। ছন্দ মাধুরীতেও তার তুলনা আধুনিক বাংলা কবিতায় দুর্লভ। নজরুলের বিদ্রোহীতে চেতনাগত দিক থেকে কবির উপলব্ধি অভিজ্ঞতা প্রকাশে ভাব ভাষা ছন্দে যে স্বতন্ত্র তাতে পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের বিদ্রোহী চেতনার একটি প্রভাব পাওয়া যায়। তবে বিদ্রোহী কবিতার চেতনা সমৃদ্ধ শিল্প রূপের বিচার করতে গিয়ে তার ভাব শব্দ আহরণ বাণী বিন্যাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নজরুল জীবনের ভিন্নতার সাথে সকল সময় সম্পৃক্ত নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত মানস চেতনার সাক্ষ্য মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহী কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র নতুন ও অভিনব সৃষ্টি। বিদ্রোহীর এই অভিনবত্ব শুধু তার বক্তব্য না শিল্পরূপের জন্য? বিদ্রোহীতে আত্মপ্রকাশের জন্য অবলম্বন হিসেবে নজরুল যে শব্দ

সম্পদ সংগ্রহ আরবি ফারসি শব্দ ভাণ্ডারের আবশ্যকতা প্রয়োজন পড়লে ভাব ও আবেগ প্রকাশে তৎসম বিদেশি শব্দ যে কোন শব্দ ব্যবহারে কবিতাকে প্রাণবান সজিব চিত্তগ্রাহী করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুল হিন্দু কাহিনী উপকথা ইতিহাস ঐতিহ্য মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য কাহিনি গ্রীক উপকথাসহ বিভিন্ন ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্রোহীর মত একটি দীর্ঘ কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য বোধের শব্দ আরশ, বেদুইন, ইস্রাফিল, জিব্রাইল, হাবিয়া দোযখ, জাহান্নাম, অর্ফিয়াস, খোদার আরশ, বোররাক প্রভৃতি শব্দ আবার অন্য দিকে হিন্দু ইতিহাস ঐতিহ্যে পুরান মহাভারত থেকে অনেক বেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন উপমা হিসেবে। বিদ্রোহী কবিতায় অধিক সংখ্যক অন্য ধর্মমতের উপমা প্রতীক উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে একদিকে তার অসীম উদারতা ও হিন্দু উপকথার প্রভাব বিহারের ক্ষমতাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। কাব্য শিল্পী নজরুল এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন যে বক্তব্যের স্বার্থে প্রয়োজনে ভাবগত ভাবে যে শব্দের আবির্ভাব সৃষ্টির মুহূর্তে জাতি বিচার ক্ষেত্রে বিচার সৃজন প্রতিভার কাজ নয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে শব্দ যথার্থ মনে হবে আহরিত হবে, ভাব শব্দ তালে অর্থ সঙ্গতি পেলে বক্তব্য বিষয় উপমা চিত্রকল্প ঐতিহাসিক পটভূমি সাযুজ্য খোঁজে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

০১. ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।
মমললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
২. আমি বজ্র, আমি ঈশাণ-বিষাণে ওঙ্কার, আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার
আমি পিণাক পাণির ডমরু ত্রিশূল ধর্মরাজের দন্ড
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচন্ড।
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
৩. তাজী বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত- হ্রেষা হেঁকে চলে
৪. ধরি বাসুকির ফণা জাপটি
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের
আগুনের পাখা সাপটি।
৫. আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
মহা বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
৬. আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা
৭. আমি ছিন্নমস্তাচণ্ডি আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
৮. জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গপাতাল মর্ত্য।
৯,. আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি, শান্ত উদার
আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
১০. আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
আমি স্রষ্টা সাধন শোক তাপ হানা
খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন!
(বিদ্রোহী)

উপরোক্ত বাক্যাংশের দিকে দৃষ্টি দিলে কবির শব্দ চয়ন, বাক্যের শব্দ প্রয়োগ তার শিল্প চেতনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যার একটি শব্দের ধ্বনিগত সুসাম্যের দিক যা কবিতার সঙ্গীত সৃষ্টিতে অপরিহার্য রূপে গুরুত্বপূর্ণ অপরটি চয়নকৃত শব্দের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা। প্রথমটির ক্ষেত্রে বলা যায়; ভূলোক দ্যুলোক গোলক তিনটি শব্দর একই ওজনের অর্থের শব্দের মধ্যে শুধু শেষ শব্দের বর্ণের মিল রয়েছে তা নয় অধিকন্তু মধ্যবর্তী ধ্বনি সমূহের একান্ত সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চিরবিস্ময়। এই স্পর্ধিত ঘোষণা তাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাপ্তি খোঁজ পেয়েছে শব্দের অনুষঙ্গে বক্তব্যের চরিত্র ধর্ম গেছে বদলে, 'উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর' এই উপমা শুধু কবি কল্পনা মাত্র নয়; সেই সঙ্গে কবির শব্দ ব্যবহারে ক্ষমতায় দীপ্ত বলিষ্ঠ 'বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর' এই বক্তব্যে বিস্ময় কবি যেমন ধ্বনিগত দিকে থেকে সুসাম্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে তেমনি সমগ্র স্তবকটি অনিবার্যরূপে পারফেকশনে পৌঁছে গেছে। এমন অনিবার্য সুনিপুণ প্রয়োগের ফলে কবিতাটিতে শুধু আবেগ অনুভূতি অবলীলাময় প্রকাশ ঘটেছে তাই নয়, বক্তব্যের তীব্রতা, পরিবেশের ভয়াবহতা, উচ্চারণের প্রচণ্ডতা হয়ে উঠেছে এক দুর্বোধ্য উচ্চারণের শব্দভেদী মহা হুঙ্কার। যা শুধু হুঙ্কার নয় মানব মনের এক চৈতন্য প্রসারী জোয়ারের মহাপ্লাবন। বিদ্রোহী কবিতায় আরো যে সকল অবাধ শব্দ চয়নের স্বতঃস্ফুর্ততা রয়েছে তাতে কবিতার ওজস্বিতা ও মুন্সিয়ানার সার্থকতা ফুটে উঠেছে। যেমন: দাবানল দাহ, হিম্মত হ্রেষা, বাসুকীর ফনা, অর্ফিয়াসের বাঁশরী, জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি, পরশুরামের কঠোর কুঠার ইত্যাদি পরিবেশ ও প্রচণ্ডতাকে করে তুলেছে এক ভয়াবহ তাণ্ডবময়। এই কবিতায় চয়নকৃত শব্দাবলির কোন একটিও বিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত কাব্যগন্ধমের ফলে মনে নাও হতে পারে কিন্তু কি তেজোদীপ্ততা প্রচণ্ডতা ও ভয়ঙ্করেরও আলাদা একটি রূপগন্ধ আছে। কবির স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে নয়; বরং বক্তব্যের যথার্থ স্থানে যথার্থরূপে ব্যবহৃত শব্দাবলি এক

বিশেষ অর্থগৌরব ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। বিদ্রোহীতে কবির স্পর্ধিত ঘোষণায় তার আবেগ মিনারের উচ্চ কণ্ঠে ধারণ করে বক্তব্যের চরিত্র অনুসারে নির্বাচিত তেমনি বিভিন্ন অংশে রোমান্টিক আর্তি আকুলতা বেদনাময় অনুভূতির শিখর স্পর্শি, সেখানেও শব্দাবলি চরিত্র আবেগ অনুভূতির সাথে এক সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেছে। এখানে তার শব্দ কুশলী কাব্য শিল্পীর সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়।

'আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেনী
তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম
উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস
হা-হুতাস আমি হুতাসীর।
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা
ব্যথা সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন ও চোর কম্পন আমি থর-থর-থর
প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন।
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা
তার কাঁকন চুড়ির কনকন
আমি চির-শিশু চির-কিশোর
আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার
আঁচর কাঁচলি নিচোর।
(বিদ্রোহী)

এই স্তবকে বিদ্রোহীর যে বীর রস তা মিলিয়ে এক রোমান্টিক ভাব আবেশের এক বিহ্বলতার ভিন্নধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফলে কবির উপমা তুলনা চিত্রকল্প ও চারিত্রিক রূপও গেছে বদলে অথচ তার শব্দের সহায়তায় বক্তব্য প্রকাশ চিত্রকল্প রচনা এবং করুণ আবহ অভিব্যক্তির প্রয়োজনে শব্দ নির্বাচন সেসবের এক সমন্বয় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলা যায়: আমি উন্মন মন উদাসীর, হুতাস আমি হুতাসীর চিত চুম্বন চোর কম্পন ইত্যাদি শব্দ অবলীলায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কাব্য রচনার ক্ষণে কবি বেছে বেছে শব্দ ধ্বনি ও স্বরসঙ্গতিকে বাজিয়ে বাজিয়ে তার কাব্যের শব্দ ব্যবহার ও বাক্য বাণী বদ্ধ করে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। এক কথায় শব্দ ধুনে ধুনে কবিতার শরীর নির্মাণ কুশলী শব্দ শিল্পীর পরিচায়ক। নজরুল যে অবলীলায় কবিতা রচনা, গান রচনা করতে পারতেন তা তার জাত কবিসত্তার পরিচয় তুলে ধরে। নজরুলের যে অসাধারণ কবি কল্পনা প্রতিভা ধ্বনি ও সঙ্গীতের পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান তা কৈশোরে সূত্রপাত ঘটেছে। কালক্রমে তা বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়ে এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবি ও সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন,

'অগ্নিবীণা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। শুধু সাহস ও নিঃসংশয় ভাষণের অধিকারীই যে নজরুলকে এই যুগ সূচনায় সাহায্য করেছিলো তা নয়, তার শিল্প কুশলতাও ছিলো এর মূলে। নজরুলের কবিতার শব্দ সম্পদ সম্পর্কে অনেকেই এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এখানে শব্দ নির্বাচিত নয় তৎসম শব্দ এবং দেশজ শব্দের মধ্যে কোন জাত বিচার নেই। কিন্তু তারা এ শব্দ বিস্মৃত হন যে, কবি যখন তার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির ভাষান্তর করেন, তখন প্রকাশের আগে ও অনুপ্রেরণাই প্রধানত তার সৃজনশীল সত্তাকে গ্রাস করে থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রকৃত প্রতিভাধর কবি এক রকম অনায়াস অবলীলায় কবিতা রচনার কাজ শেষ করেন। কেন না ছন্দের মতই কবিতার ভাষাও কবির অজ্ঞাতসারেই কবিতায় এসে ধরা দেয়। মহাকবি গ্যাটে বলেছেন: কবিতা লেখার সময় তাকে যদি স্বজ্ঞানে ছন্দের খুঁটিনাটি আইনের কথা ভাবতে হয় তাহলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকতো না। কবিতার ছন্দ বিষয়ে এ বক্তব্য যেমন সত্য কবিতার শব্দ তথা ভাষা সম্পর্কেও তেমনি সত্য।'

মানব জীবনে আঘাত সংঘাতের অন্তরালে একটি প্রশ্নসংকুল ক্লান্ত হৃদয় পাঠককে চকিত করে সে অনুভব আমাদের প্রাণসত্তাকে আলোড়িত করে না। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবন সংগ্রামের রুঢ় বাস্তবতায় স্পর্শ আছে। কিন্তু তাকে নজরুলের মত বিদ্রোহী করে তুলেনি, চিন্তান্বিত করেছে মাত্র তাই সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার জিজ্ঞাসা:

'আমরা যখন সুখে সুখী হই
সে নহে তোমার দান তোমার বিধান নহে যে
আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে
সে কৈফিয়ত তুমি কোনদিন
দেবে না কাহারও কাছে।

কবির এমন জিজ্ঞাসায় দুঃখ জর্জরিত ব্যথিত কবি হৃদয়ের কান্না করুণ আর্তি যেমন প্রকাশ পায়নি তেমনি অসহায় সর্বহারা মানুষের মুক্তি তাদের অন্তিম ফরিয়াদ ধ্বনিত হয়নি। তবুও যতীন্দ্র সেনগুপ্তের যে চাপা ক্ষোভ ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ লঘু পরিহাসের সূচনা, আর নজরুলে তা বলিষ্ঠ বিদ্রোহীর স্পর্ধিত ঘোষণা মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ভাঙার গান স্বরূপে সরবে উচ্চকিত উচ্চারণ। যে উচ্চারণের ভাব ভাষা স্বতন্ত্র, তার স্বরগ্রাম ভিন্নখাদে প্রবাহিত। বিদ্রোহীর চেতনা তার প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যধর্মিতার স্বরূপ উৎস সন্ধান করতে গেলে কবির উক্তি উল্লেখ করতে হবে। নজরুল বলেছেন, 'আমার বিদ্রোহী পড়ে যারা আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তারা যে হাফেজ রুমীকে শ্রদ্ধা করেন এও আমার মনে হয় না। আমিতো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাদের। এরা কি মনে করেন। হিন্দু-দেব-দেবীর নাম নিলেই ফাকের হয়ে

যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি কোনভাবেই সম্ভব হবে না, জৈগুন বিবির পুঁথি ছাড়া। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন প্রবলভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও বাধা দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ যেমন চিন্তা করতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিত্য প্রচলিত মুসলমান শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভ্রু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, হিন্দুদেব দেবীর নাম নেই। আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য লক্ষ্মীর অর্ধেক মুসলমান। তারা তাদের কাছ থেকে ধূতি আর আচকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারোঙ্গীর সুর শুনতে, চায় কুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচার বুলবুলি সুর।

কবির এ উক্তি থেকেই বোঝা যায় স্পষ্ট যে, নজরুল বিদ্রোহী চেতনার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন হাফেজ রুমী খৈয়ামের কাছ থেকে পারস্য সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে। বাংলা কাব্য পাঠ তাকে তার অনুভব আরো গভীর শানিত ও আত্মপ্রত্যয়ে প্রকাশের ভাষা যুগিয়েছিল। ফার্সি কাব্য পাঠ তার চেতনার রাজ্যে পরিভ্রমণ নজরুল কাব্য সীমাহীন গভীরতর অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে। কবিতার ভাব ও ভাষায় তিনি যে বৈচিত্র্য এনেছেন তাকে যুগান্তকারী বলতেই হবে। কারণ তার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদারও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তা বাক্য গঠনে ভাব রচনায় বলিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠেনি। যেমনটি দেখা যায় নজরুল কাব্যের বেলায়। আরবী ফার্সি শব্দ ব্যবহারে নজরুলের কুশলী কাব্য শিল্প মানসিকতার পরিচয় শুধু বিদ্রোহী নয় কুরবানী, খেয়া পাড়ের তরণী, মহররম, শাতিল আরব, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশাসহ অনেক কবিতায় ইতোপূর্বেই পাঠক সমালোচকের হৃদয়মনকে আকৃষ্ট করেছে। যা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব এক সংযোজন।

বিদ্রোহী কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ, ছন্দ বিচার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছান্দসিকেরা যে বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করেন তা হলো বাংলা কবিতার ছন্দের যে তিনটি শাখা তার মধ্যে নজরুল স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে বেশি কবিতা রচনা করেছেন। নজরুল কাব্যের শরীরবৃত্তিক আলোচনায় ছন্দের প্রকৃত ও চরিত্র বিচারে কোন কোন সমালোচক অন্তরনিহিত কারণ আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। কাব্য রচনার প্রারম্ভে নজরুল প্রধানত স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। নজরুলের কবি মানস বিচার করতে গেলে তার জীবনের সূচনা পর্ব দেখতে হবে, কিশোর বয়সে নজরুল লেটোর দলে গান ও কবিতা রচনার যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা অভূতপূর্ব। লেটোর দলে গান রচনা, তাতে তাৎক্ষণিক সুর সংযোজনা ও পরিবেশনার খাতিরেই তিনি স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের ছন্দের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই গীতি কবিতা রচিত হয়েছে। আর গীতি কবিতা রচনায়ও নজরুল শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই সহজাত গীতি ধর্মিতা নজরুলের কামাল পাশাসহ অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নজরুলের ছন্দচয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় ছান্দসিক কবি আব্দুল কাদির বলেন, 'নজরুলের প্রথম জীবনের তিনটি গাঁথা মুক্তি, চিঠি ও অভিমানী রবীন্দ্রনাথের পলাতকার সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তিনি এ ছন্দেই কিছু কাল পর তার সুবিখ্যাত কবিতা কামাল পাশা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনাটুকু সংবচন করে দিয়ে তার বাংলা ছন্দের প্রকৃতি (বৈশাখে ১৩৪১) প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে, এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি রয়েছে। একথা মানব না। এই যে বাংলা বাঙালির দিন রাত্রীর ভাষা এর একটি মস্তগুণ, এ ভাষা প্রাণবান , এই জন্য সংস্কৃত বল, ফার্সি বল, ইংরেজি বল, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত অনেক ছন্দোবিদ অগ্রাহ্য করেছেন কিন্তু তারা লক্ষ্য করেননি যে পল্লীর বহু পালা গানে এ ঘরোয়া ছন্দযজ্ঞ বাহাদুরী চমৎকার ফুটেছে। আর আধুনিক বাঙালি পাঠক মাত্রই নজরুলের কামাল পাশা, প্রলয়োল্লাস প্রভৃতি পড়ে নিঃসন্দেহে বুঝেছেন প্রকৃত বাংলা ছন্দে বীর রসের কবিতা শক্তি মানের হাতে সংরক্ষিত হলে রসের ন্যূনতা ঘটে না। (বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম: নজরুল পরিচিতি, পৃ. ১৪২)

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পর্ববিভাগে ও মাত্রা নির্ধারণে ছন্দ বিশ্লেষকদের মধ্যে মত বিভেদ রয়েছে। তবে বিদ্রোহী সামিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছান্দসিকদের মতে বাংলা ভাষায় নজরুল এ ছন্দের প্রবর্তক। কবিতাটি প্রধানত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, কিন্তু যেহেতু এটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সে কারণে এতে সর্বত্রই প্রতিপর্বে সমানুপাতিকভাবে মাত্রার ইতর বিশেষ ঘটিয়ে কবিতাটি বিচিত্ররূপে সংস্থাপিত। এ কারণেই বিদ্রোহী কবিতার পর্ব বিভাগে ও মাত্রা নির্ধারণে সৈয়দ আলী আহসান পর্ব ভাগ করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

১. আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত আমি অগ্নি (২) ৫.৬ (৬)
২. আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয় আমি শ্মশান (২) ৫ঃ৫ঃ৬ (পাঁচ মাত্রা করে একটি পর্ব রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দাংশগত ঝোঁকের জন্য মাত্রার স্বল্পতা ঘটেনি।)
৩. আমি বজ্র, আমি ঈষাণে বিষাণ ওঙ্কার (২) ৫.৬ (৪)

অন্যদিকে কবি ও সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের মতে তিনি পর্ব ভাগ করেছেন এভাবে:

১. আমি হোম শিখা, আমি স্বাপ্নিক জম দগ্নি।
২. আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি
৩. আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান আমি অবসান নিশাবসন।

কিন্তু নজরুল গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ মনে করেন নিম্নরূপ:

১. আমি হোম শিখা আমি সাগ্নিক জম দগ্নি
২. আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত আমি অগ্নি
৩. আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান
৪. আমি অবসান নিশা অবসান।

কারণ দ্রুতলয়ী পড়ার ঝোঁক এবং উচ্চ কণ্ঠ উচ্চারণ ও অর্থসংগতির দিক থেকে পর্ববিভাগ উদ্ধৃতরূপেই হওয়া সম্ভব। আমি অতি পর্বটি শুধু কবিতার প্রতি পংক্তির সূচনাতেই নয়, মধ্যবর্তীতেও রয়েছে, কিন্তু পড়ার ঝোঁক এবং দ্রুতলয়তার আমি অতি পর্ব হিসাবেই উচ্চারিত হয় এবং মধ্যবর্তী আমি অতি পর্বটি একটু থেমে সাগ্নিক জম এই ছয়মাত্রায় পূর্ণ পর্ব এবং অগ্নি এই তিন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব হিসাবে উচ্চারিত হয়। সূচনায় আমি যজ্ঞ, আমি সৃষ্টি ইত্যাদি পাঁচ মাত্রার পরই উচ্চারণের প্রত্যয়ী দৃঢ়তায় ছ'মাত্রায় শক্তি অর্জন করেছে। আর এভাবেই নিশাবসান উচ্চারিত হয় নিশা অবসান রূপে। আর একারণেই সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন শব্দাংশগত ঝোঁকের জন্য মাত্রার স্বল্পতা ঘটেনি। কবিতাটির ছন্দ বিচারের সময় ও পাঠে উচ্চারণের দিক থেকেও পংক্তি বিন্যাস নিম্নোক্তভাবে হওয়া উচিত বলে মাহফুজ উল্লাহ মনে করেন।

১. আমি হোম শিখা
আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
২. আমি যজ্ঞ
আমি পুরোহিত
আমি অগ্নি
৩. আমি সৃষ্টি
আমি ধ্বংস
আমি লোকালয়
আমি শ্মশান।
৪. আমি অবসান নিশাবসান।

একথা বলতেই হবে নজরুলের কাব্যে ছন্দ বিষয়ে যে সাফল্য, যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি তার পেছনে তার সাংকেতিক অতিসূক্ষ্ম গানের কান বা শ্রুতি দক্ষতা। শুধু মাত্রাবৃত্ত নয় স্বরবৃত্ত ছন্দেও তার সামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবি ও গবেষক আব্দুল কাদির বলেছেন, 'নজরুল ফার্সি গজলের রূপান্তর করতে গিয়ে ছন্দের বিচিত্র কারুকার্যের দিকে তার নজর পড়ে। গজল গান রচনার যুগে নজরুল স্বরবৃত্ত ছন্দের সিলেবলগুলিকে নানা নিয়মে সুবিন্যস্ত করে নতুন সৃষ্টির ইশারা দেন। নজরুল তরুণ বয়সেই দীওয়ান-ই-হাফিজের বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে এ দুরূহ ছন্দের প্রারম্ভিক ছন্দধ্বনির রহস্য আবিষ্কার করেন। নজরুল এই প্রারম্ভিক রীতিতেই তার আরবি ছন্দের কবিতা রচনা করেন। নজরুল প্রথম বয়সে সংস্কৃত ছন্দে কিছু কবিতা রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তার ছায়ানট কাব্যের পূবের হাওয়া পূর্বতরঙ্গ কবিতার কিছু অংশ শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। নজরুলের সূক্ষ্ম শ্রুতি সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য সম্যক আকৃষ্ট হয়নি। বাংলা ছন্দের নব নব উদ্ভাবনে তার মানসচিত্ত সাড়া দিয়েছে সুরের প্ররোচনায়। মূলত ফার্সি ছন্দের অনুশীলন করতে গিয়েই কবি ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্যময়তার দিকে নজর দেন। পল্লীর পুঁথি সাহিত্যে কবিয়াল গানের পরিবেশ তার কবি মানসকে প্রথম আলোড়িত করেছিল। তিনি তার মাত্রাবৃত্ত বহু কবিতায় পুঁথি সাহিত্যের ভঙ্গিতে রচনা করেছেন। অনেক কবি গানে গ্রাম্য কবিয়াল চত্বরে কবিতা রচনা করেছেন। (বাংলা ছন্দও নজরুল ইসলাম, নজরুল পরিচিত-১৪১-১৪৯)

নজরুল কৈশোরেই ছন্দপ্রীতির কারণে লেটোদলে যোগদান ও মুখেমুখে গান বেঁধে তা সুর করে পালা করে উপস্থাপন করতেন। আর তখনই তার ছন্দ জ্ঞান সূচনাটা হয়ে যায়। তার পূর্বসূরী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার এরাও প্রধানত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও স্বরবৃত্ত ছন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। শুধু যে তা বর্ণনামূলক কবিতা নয়, আহউম্মিলন ধর্মী এবং গভীর চেতনাজাত কবিতাও মোহিত লাল মজুমদার মাত্রাবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তার সংলাপধর্মী কবিতা ও সনেটে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অবলম্বন করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে মোহিত লাল খুব যে সূক্ষ্ম কারুকার্য কর্মের পরিচয় দিতে পেরেছেন তা নয়, যতীন্দ্র সেন গুপ্তের তেমন কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা মোহিত লাল মজুমদার কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কারো মধ্যেই দেখা যায় না। কিন্তু নজরুলের মধ্যে তা দেখা গিয়েছিলো, কেননা বাংলার নব নব ছন্দের উদ্ভাবন তার মন সাড়া দিয়েছিলো সুরের প্রয়োজনে। তিনি গীতি ধ্বনি বিস্তার বিলম্বিত করতে ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্যের ব্যাপারে ফার্সি কবিতা ও গজলের ছান্দিক আদল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নজরুল ছন্দ চর্চা করেছেন কবিতা গানের প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনে। নজরুল কবিতায় ভাব ভাষা বা বক্তব্য বিষয়ে ছন্দের দাসত্ব করেননি। বরং মোহিত লাল মজুমদার বলেছেন, 'ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে এমনটিই ঘটেছে।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় যে ছন্দ নৈপুন্য তা যতখানি না ভাব বক্তব্য বিষয়ের প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি ছন্দের নিজস্ব টেকনিক্যাল কারণে সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতা কৃতিত্ব সম্পর্কে মোহিত লাল মজুমদার বলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবি কৃতিত্বের দাবী তার বাংলা ভাষার পরিমার্জনা ও আলংকারিক বিন্যাস পর্যাপ্তই।' এদিকে ছান্দসিক কবি সমালোচক আব্দুল কাদির বলেছেন, ছন্দ নিরুপিত হয় ধ্বনিগত গাণিতিক নিয়মে। ছন্দ গঠনের মূলে থাকে কবির সচেতন মনের ক্রিয়া কিন্তু ক্রিয়া থাকে অগোচর। তা সুগোচর হলে কবিতা হয় ছন্দ সর্বস্ব, কাঠামো হয় অতি প্রকট, কবিতার প্রাণ পড়ে চাপা। নজরুল ছন্দ চর্চা করেছেন কবিতার প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনে। অর্থাৎ নজরুলের কবিতার ভাব বা বক্তব্য বিষয় ছন্দের দাসত্ব করেনি বরং ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে এমনটিই হয়েছে। নজরুলের কবিতা পড়ে মোহিত লাল মজুমদার বলেছেন, ভাবের মাহাত্ম শব্দের ধ্বনি গাম্ভীর্য ছন্দের সুকারুকার্য কর্ম এবং রূপ রচনার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়েছি। খেয়াপাড়ের তরণী কিংবা

বাদল প্রাতের শরাব অক্ষরবৃত্তে রচিত নয়, কবিতা দুটি যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে ছন্দে রচিত কিন্তু বাংলা কবিতায় দুটি প্রচলিত ও বহু ব্যবহৃত ছন্দে রচিত হওয়া সত্ত্বেও কবিতা দুটিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল নজরুলের কবি কল্পনা প্রতিভা, শব্দ চয়ন ক্ষমতা সব কিছুকে অবলীলায় ফুটিয়ে তোলার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা গুণে। মোহিত লাল আরও বলেন, কাজী সাহেবের ছন্দ তা স্বতঃউৎসারিত ভাব কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমন ভঙ্গী কবির খেয়া পাড়ের তরুণী কবিতায় ছন্দ সর্বস্ব মূলত এক হইলেও মাত্রা বিন্যাস ও যতির ব্যবহার বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাব অনুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে। ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে বসে নাই। ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে; ছন্দ নিছক গাণিতিক নিয়মে পরিণত না হয়ে ভাবের অনুসারী হয়ে মাত্রাবিন্যাসেও যতি স্থাপনে যে বিরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা বিদ্রোহী কবিতায় লক্ষ্য করেছি।' আব্দুল মান্নান সৈয়দ তার এক প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন যে, নজরুল কেন তার কবিতায় নির্ভর করলেন না। বাংলা ছন্দের মেরুদণ্ডের উপর অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এত কম প্রয়োগ করলেন কেন তার কবিতাগুচ্ছে। (উড়নচণ্ডি করি টেকা ছন্দ তার শিল্পকলা জুন-১৯৭২) এই প্রশ্ন শুধু নজরুলের একার ক্ষেত্রে এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার এমন কি জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেও এ বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। জীবনানন্দ দাশ অক্ষরবৃত্তে লিখলেও মূলত মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই স্বাচ্ছন্দ বিহারী ছিলেন। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী কবিতায় ভাব ভাষা ছন্দে এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সৃষ্টি করেছে কখনো বীররসের প্রবল প্রতাপ আবার প্রেমের নিকুঞ্জ পথে পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ভাব ভাষা ছন্দ মাধুর্যে বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের বিস্ময় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে; থাকবে চিরকাল বিশ্বাস আমাদের আছে।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: বিপ্লববাদ ও প্রেমবাদের সমন্বয়

কাজী নজরুল ইসলাম এক রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি। রোমান্টিক স্বপ্ন সৌন্দর্য চেতনার রূপকার হিসেবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই রোমান্টিক শিল্প সাধনা তার কবি সত্তার অস্থিমজ্জায় শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। কিন্তু কবিতা-গান-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তার যে অবাধ বিচরণ; তার পেছনে যে প্রেরণা এই দেশ, দেশের মানুষ, দেশের প্রতিটি ধূলিকণা, সমকালের দাবী, সব মিলিয়ে এক গণকবিকে দেখতে পাই। কবিতায় শুধু সৌন্দর্য চেতনা নয়, কবিতায় মুখ্যত গণ মানুষই প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তার কাব্যে গণমানুষের অভাব অভিযোগ দুঃখ দারিদ্র্য তাদের চাওয়া না পাওয়ার বেদনা, তাদের স্বাধীনতা মুক্তি নজরুল কাব্যের মৌল সুর।

নজরুল কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক গান-শিশু সাহিত্য প্রতিটি শাখায় যে সৃষ্টি সেখানে জীবন জগৎ-মানুষের মুক্তি অধিকারকে বড় করে দেখেছেন, চিরন্তন মানবতার অব্যক্ত ধারাকে তুলে ধরেছেন। অতিমাত্রায় মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তার সাহিত্য কর্মে শিল্পমান অনেক সময় ক্ষুণ্ন হতে দেখা যায়, কিন্তু যে গণ মানুষের মুক্তির সুর তার কবিতা ও সাহিত্যে ধ্বনিত হতে দেখা যায় তাকে অবশ্য মানবতাবাদী মহৎ সাহিত্য কর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হবে। কারণ সাহিত্যে শুধু শিল্পমান নয়; মানুষই মুখ্যত। আর মানুষের জন্যই সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত, কোন ইতর প্রাণীর জন্য নয়। সুন্দরের ধ্যান কল্পনা বিলাস কবিতার ভাষা আর রং তুলিতে সুন্দরের কথা তুলে ধরেন শিল্পী। আর মানুষের কথা, তাদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে কবিকে শিল্পীকে কারাগারে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। কবিরা সত্যের কথা বলেন, নবীরা সত্যের পথ দেখান। মূলত কবি ও নবীর কোন পার্থক্য নাই শুধু ঐশিবাণীটুকু ছাড়া। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কবি সাহিত্যিক নাট্যকার শিল্পীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কাউকে আবার অকথ্য জুলুম নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। তবুও মানব প্রেমিক কবি সাহিত্যিক লেখক শিল্পীগণ তাদের লেখায় মানুষকে, মানুষের অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন; সেখানে সাহিত্যের নন্দন তত্ত্ব বজায় থাকলো কি থাকলো না সেটি বিবেচনায় নেননি তারা। মানুষই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়। নজরুল মানুষকে বড় করে দেখেছেন।

বলেছেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান', সত্যি তাই। কাজেই সেখানে শিল্পমান মুখ্য নয়, গৌণ বিষয়। তার শিল্প মানস বিশ্লেষণ করতে গেলে তার বক্তব্যই যথেষ্ট। আমি শুধু সুন্দরের হাতের বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে গোরস্থানের পথে, তাকে ক্ষুধাদীন মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের

অন্ধকূপেও তাকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি। (প্রতিভাষণ নজরুল রচনা সম্ভার পৃ. ৯৭) এই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই বিদ্রোহী কবি স্বীয় শিক্ষা মানস সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছেন,
'একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি সুন্দর রূপ সুন্দরকে ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কিটসের মত আমার মন্ত্রঃ

Beauty is Truth, Truth is Beauty-এই রূপতত্ত্ব ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা। কবি চিত্তে ফল সুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে। যুগ সমস্যা আর্তপীড়িত, রাজনীতির কোলাহল, সামাজিক অস্থিরতা নজরুলের কণ্ঠে আমরা চারণ কবির বাণী শুনেছি। সে বাণীতে রয়েছে মানবমুক্তির সুর; আবার প্রেম ও যৌবনের নামে ও তার উল্লাস, নাম প্রকাশের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু তিনি যে সত্য ও সুন্দরের পথের যাত্রী তা ভাস্বর হয়ে আছে। কবি বলেছেনঃ

'যে ধ্যানী যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্প পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে, উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপন কুমারীকে রূপ কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করিবে।
(তরুণের সাধনাঃ নজরুল রচনা সম্ভার-পৃষ্ঠা. ১০৫)
ইংরেজ কবি শেলীর ভাষায়ঃ

But it is mistake to suppose that I dedicate my poetical compositions solely to the direct enforcement of reform, or that I consider them in any degree as containing a reasoned system on the theory of human life. Didactic poetry is my abhorrence; nothing can be equally well expressed in perpose that is not tedious and supererogatory in verse, My purpose has hitherto been simply to familiarize the highly refined imagination of the more select classes of poetical readers with beautiful idealisms of moral excellence; aware that, until the mind can love, and admire, and trust, and hope, and endure, reasoned principles of moral conduct are seeds cast upon the highway the unconscious passenger tramples into dust, although they would bear the hervest of his happiness. শেলীর মত নজরুলও ছিলেন তাঁর কবিমানস সম্পর্কে সচেতন, তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন :

'ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে ফেলেও দিইনি। আমি গোধূলি-বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবারী নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা। সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে–সেই অসুরের জন্য।'

সুন্দরের আবাহন, ফুল ফোটানোর ব্রত–এই ছিল নজরুলের স্বভাবধর্ম, কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে এবং স্বভাব-প্রকৃতির অকৃত্রিম আহ্বানে নজরুলকে একদিকে সুন্দরের স্তবগানে, অন্যদিকে অসুন্দরের বিরুদ্ধে সাহসী-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। নজরুলের এ-ভূমিকা সম্পর্কে শেলীর ভাষায় বলতে হয় : not otherwise than philosophers, painters, sculptors and musicians, are in one sense, the creators, and in another, the creations of their age. From this subjection the loftiest do not escape, নজরুল ছিলেন স্বভাবত সৃষ্টিধর্মী শিল্পী-সৃষ্টিশীল কবিকর্মেই ছিল তাঁর আনন্দ কিন্তু যুগের প্রয়োজনে এবং নানা ভাব-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে তিনি যুগের সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছেন। মৌল প্রকৃতিতে নজরুল ছিলেন নির্জনতাবিলাসী এবং আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক, যদিও তিনি বলেছেন, 'আমার সাহিত্য সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্বিত্বকে existence-কে খুঁজে ফিরেছি।' কিন্তু যুগের creation হতে গিয়ে তিনি তাঁর loftiest সত্তাকেও বিস্তৃত না হয়ে পারেননি, কিন্তু যখনই তিনি সেই নির্জন আত্মমুগ্ধতার আহ্বান শুনেছেন তখনই তাতে সমর্পিত হতে চেয়েছেন, তাঁর ভাষায় :
'বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বারে বারে কেড়ে এনেছে সেই মৌনীর কোল থেকে নিগড়ের পর নিগড় দিয়ে আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে। আমিও বারে বারে ছিন্ন করেছি সেই বন্ধন, বারে বারে পালিয়ে যেতে চেয়েছি সেই পরম একাকী শান্ত সমাধি-তলে এবং দোটানার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আমি আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি।
[মধুরম, নজরুল রচনা-সম্ভার, পৃঃ ১৪০]

নজরুল-মানসের এই দ্বন্দ্বের উৎসমূলে রয়েছে তাঁর সমসাময়িক কাল ও যুগ-সমস্যা। যুগ-সচেতন হতে গিয়ে তিনি তাঁর মৌল কাব্যাদর্শ থেকে অনেকক্ষেত্রে সরে গেছেন সত্য কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসার যে অনির্বাণ দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছেন তাই তাঁকে কাব্যাদর্শের আচ্ছন্ন প্রদেশে নতুন আলোকপাতে ব্রতী করেছে। 'নজরুল বেদনা-সুন্দরের গান রচনা করেছেন অগণিত গণ-মানুষের জন্য :

'স্রষ্টাকে আমি দেখিনি কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নিচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি

একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, এদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই।'
[ইব্রাহিম খানকে লিখিত চিঠি]

নজরুল শুধু আবেগ-প্রবণতাকে মূলধন করে গণ-সংযোগের কথাই ভাবেন নি, গণ- সাহিত্যের রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন। সাহিত্যে জন-জীবন প্রতিফলিত করতে হলে সে জীবনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, জন-জীবনের মর্মমূলে অনুপ্রবেশ করে রসের উৎস সন্ধান করতে হবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ প্রগতি সত্ত্বেও, এ-সাহিত্যের উৎসমূল যে পুরোপুরি দেশের মাটিতে নিহিত ছিল না, নজরুলের এ-বোধ ছিল উচ্চকিত। বাংলা সাহিত্যের নতুন ভাবধারাকে স্বাগত জানিয়ে এবং এর অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণাকে স্বীকার করে নিয়েও নজরুল যে আধুনিক সাহিত্যের আঙ্গিক-বৈচিত্র্যকে সর্বক্ষেত্রে মেনে নেননি, সে সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা বিভিন্ন ভাষণে উল্লেখযোগ্যরূপে প্রতিফলিত। সাহিত্যের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিল্পসম্মতরূপে তাকে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি ব্যাপারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সচেতন প্রচেষ্টায় নানা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়ব্যাপ্তি ও শিল্পসম্মত প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে অনেকটা ছিন্নমূল হয়ে উঠেছে, সে-সম্পর্কে নজরুল ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁর ভাষায়,

'আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি করে চলে?... যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল (intellectual), তাঁদের আমি জনসাহিত্য গড়ার জন্যে আসতে বলি না।....এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দুঃখ করলে কোন লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।'
[জন সাহিত্য, নজরুল-রচনা-সম্ভার, পৃ. ১২৩]

শেলির মত নজরুলও নির্দ্বিধায় বলেছেন, 'ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারী হয়তো আমার হাতের বোঝা কিন্তু তাই বলে তাকে ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলী বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সাথে সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবারী নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারী সুন্দরের অবমাননা করে যে, সেই অসুরের জন্য।

চির সুন্দরের আবাহন, সত্য পথের পথিক, ফুল ফোটানোই যার স্বভাব ধর্ম, কিন্তু সমকালীন যুগ ধর্মের প্রভাব, প্রেম প্রকৃতির শাশ্বত চেতনা একদিকে সুন্দরের স্তবগান, অন্যদিকে অসহায় নিপীড়িত মানুষ, তাদের দুঃখ বেদনা আর্তনাদ তাকে ব্যথিত করেছে, চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ অকুতোভয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, হয়েছেন এক বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী বীর। নিঃশঙ্কচিত্তে কবি বলেছেন,
'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য।' (বিদ্রোহী)

নজরুল এক ভাব-বিহ্বল রোমান্টিক স্বপ্নময়তার কবি। কিন্তু সমকালের দাবী সমাজের নানা অসঙ্গতি অবক্ষয়, গণমানুষের আর্তনাদ তাকে স্বপ্নময় জগতে থেকে টেনে ধুলার পৃথিবীতে এনেছে। তার কবিতা গান হয়েছে মানুষের মুক্তি ও জাগরণের হাতিয়ার। কাব্য সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন মানবমুখী গান চৈতন্যের দিশারী। তার সাহিত্যে মানুষের মুক্তির মাঝে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কারণ, তিনি মানুষের মূক মুখে মুক্তির বাণী, ভাষাকে শাণিত তরবারী করেছেন। আর এই কারণেই তিনি বলেছেন–
'আমার সাহিত্য সাধনা বিলাস ছিলো না, আমি আমার জন্মস্থান থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে existence কে খুঁজে ফিরছি। কিন্তু যুগের Creation হাতে নিয়ে তিনি তার Zoffiest সত্তাকেও বিস্মৃত না হয়ে পারেননি। কিন্তু যখনই তিনি নির্জন আত্মমুগ্ধতায় আহ্বান শুনেছেন তখনই তাতে আত্মসমর্পিত হতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন, বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বারে বারে কেড়ে নিয়েছে, সেই মৌনবীর কোল থেকে নিগড়ের পর নিগড় দিয়ে আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে। আমিও বারবার ছিন্ন করেছি সেই বন্ধনে, বারে বারে পালিয়ে যেতে চেয়েছি সেই পরম একাকী শান্ত সমাধি তলে এবং দোটানার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আমি আমাকে কর্মের শাস্তি দিয়েছি।' (মধুরম-নজরুল রচনা সম্ভার-১৪০ পৃষ্ঠা)

নজরুল মানসের দ্বন্দ্ব ও তার উৎসমূল সমকালের নানাবিধ রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যার মাঝে নিহিত রয়েছে। সমকাল চেতনা তাকে অনেকটাই কাব্যাদর্শ ও শিল্প চেতনা থেকে দূরে সরিয়েছে কিন্তু গণ মানুষের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ দায়বদ্ধতা তাকে দ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছে, তাতে ব্রতি হয়েছেন। নজরুল মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন, বেদনা সুন্দরের বীণায় গান করেছেন মানুষের জন্য। কবি বলেন,

স্রষ্টাকে আমি দেখিনি কিন্তু মানুষকে দেখেছি। ধুলিমাখা অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে, চির রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নিচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায় সকল অসহায়ের অশ্রুজল আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, এদের সাথে প্রাণ ভরে কাঁদতে যেন পাই।' (ইবরাহীম খাঁকে লিখিত পত্রের অংশ বিশেষ)

নজরুলের এই চেতনা, মানবপ্রেম সাহিত্যে নানাভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন প্রবন্ধে, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, সর্বোপরি কবিতা গান তো বটেই। ফলে গণ সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও সাহিত্যে জনজীবন সম্পর্কে তার স্বচ্ছ একটি ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বজনীন গতি প্রকৃতি প্রগতি,

সাহিত্যের উৎসমূলে যে পুরোপুরি দেশের মাটি ও মানুষের মাঝেই নিহিত, নজরুল সে বোধের দ্বারা তাড়িত ছিলেন। নজরুল আধুনিক সাহিত্যের আঙ্গিক বৈচিত্র্য সর্বক্ষেত্রে মেনে নেননি। সে সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তিনি বিভিন্ন ভাষণ অভিভাষণে ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন,

'আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সম্পর্ক নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি চলে? যারা ইনটেলেকচুয়াল তাদের আমি জনসাহিত্য পড়ার জন্য আসতে বলি না। এ পথ সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পেছনে। পরে দুঃখ করলে লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।'

(জনসাহিত্য, নজরুল রচনা সম্ভার- পৃ: ১২৩)

নজরুল জনগণের ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। আর তাই সাহিত্যকে জনসাহিত্য বা গণসাহিত্যও বলা যেতে পারে। তিনি জানতেন সাহিত্যে জনজীবন রূপায়িত করতে গিয়ে তাকে হয়তো খানিকটা শিল্প ত্রুটি-বিচ্যুতি দায়ে পড়তে হবে; যেহেতু তার জনসাহিত্য সৃষ্টি প্রচেষ্টায় কোন বিলাসিতা ছিলো না জনজীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই জনসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। নজরুল বলেন,

সত্য সত্যই আমার লেখালেখিতে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তাহলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্য দর্শন না হয় খাটো করতেও রাজি আছি। (ইবরাহীম খাঁকে লেখা চিঠি, নজরুল রচনা সম্ভার- পৃ: ১৮৫)

বিদ্রোহী সত্তার জয়গান গাইতে গিয়ে কবি অনেক ক্ষেত্রে শিল্পের নিয়ম নীতি এড়িয়ে গেছেন; কিন্তু নজরুল জানতেন বিদ্রোহ শুধু সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়; যুগের দাবীতে তাঁর শিল্পী সত্তার বিরুদ্ধেও কারণ নজরুল Moral Excellence সৃষ্টি করবার প্রেরণায় ছিলেন উৎসর্গিকৃত।

উপমহাদেশের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছিলো। ব্রিটিশ ভারতের পরাধীনতা জুলুম নিপীড়ন তাঁর সংবেদনশীল কবি মানসে সহমর্মিতা ও আবেগের সৃষ্টি করেছিল। শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে তাদের স্নেহ বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করেছে সত্য; তবে পরবর্তী জীবনের মানস গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা, স্পর্শ কাতরতা মনে জাগিয়ে তুলেছিল প্রেম ভালোবাসার আকুতি তা যেন তাসের ঘরের মত উবে গেলো। বিক্ষুব্ধ মনে আস্তে আস্তে স্বপ্নময়তা দূরীভূত হলে, সেখানে কঠিন কর্মের সংগ্রামী বিদ্রোহী চেতনায় তাড়িত হতে থাকলো। কবি যে স্বপ্ন সৌন্দর্যের সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরস্পর বিরোধী মানসিকতার সমন্বয়, কোমলে কঠোরে মিলেমিশে এক অপূর্ব সৃষ্টি কল্পনা করেছেন, যেখানে মানুষের অধিকার স্বীকৃত হবে, মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকারের সাথে স্বাধীনভাবে বাঁচার ন্যায় সঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, ততদিন তিনি তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। কবি বলেছেন

'আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রনিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।' (বিদ্রোহী)

নজরুল ইসলাম শোষিত নিপীড়িত মানুষের কবি হিসেবে চাওয়া না পাওয়া, অধিকার গণ দাবীকে তার সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, সহজ সরল ভাষায় তাদেরই মুখ নিঃসৃত ভাষায় যাতে এ সকল সাধারণ মানুষগুলো বুঝতে পারেন সে ভাষা। আর তাই তিনি এত জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কোন কোন সমালোচক তার এই জনপ্রিয়তা আড়চোখে দেখেন। মহাকালে তা কতদিন টিকে থাকবে কিন্তু সমকাল যেমন তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়ে গণ কবির মর্যাদা দিয়েছে তেমনি মহকালও তাকে কালজয়ী আসনের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি শুধু একজন সাহিত্য স্রষ্টা কবিই নন; তিনি মানবপ্রেমিক, নারী প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, প্রেম ছাড়া বিশ্ব সৃষ্টি হয়নি তাই যার ভেতরে প্রেম নেই তিনি একজন মানুষ দাবী করতে পারবেন না। নজরুল মানব প্রেমিক নারী প্রেমিকতো বটেই। কাজেই তার কবিতায় রোমান্টিকতা থাকবে না, হতেই পারে না। আগেই বলেছি বিদ্রোহী কবিতা কোমলে কঠোরের এক অপূর্ব মিশ্রণ।

'আমি বন্দন হারা কুমারীর বেণি, তন্বি নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি-
আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী, চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন-চুড়ির কনকন।
আমি চির শিশু, চির কিশোর
আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার আচল কাঁচলি নিচোর। (বিদ্রোহী)

বিদ্রোহী কবিতার উপরোক্ত বার লাইনে যে বক্তব্য তার ভাব ভাষা তাতে কি বোঝা যাবে এখানে বিদ্রোহের কোন অবকাশ আছে বা প্রতিবাদের কোন ভাষার লেশ মাত্র আছে। মোটেই না। মূলত বিদ্রোহী কবিতাই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কবিতা যাতে বহুমাত্রিক বহু আঙ্গিকে বলা যায় বিচিত্র ভাবের সমাবেশ কবিতায় ঘটেছে। উপরোক্ত লাইন ক'টিতে নজরুল প্রেমিকরূপ ও নারী প্রেমের চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন কি এক সমর্পিত প্রেমিক পুরুষকেও দেখতে পাচ্ছি আমরা। তার প্রেমিক সত্তার পরিচয় দিতে গেলে আরো গভীরে যেতে হবে। তার গৌরকান্তি

পৌরুষদীপ্ত চেহারা যে কোন নারীকেই আকৃষ্ট করবে, প্রেম পাগলিনী করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়। তার জীবনে এমন ঘটনাও কম ঘটেনি। নার্গিসের প্রেম তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, তবুও নার্গিসকে তিনি পেলেন না বা নার্গিসের সাথে তার মিলন হলো না। বড় মানুষের জীবনে এমন বড় ট্র্যাজেডি থাকেই। নার্গিসকে তিনি ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন কিন্তু বিয়ে টিকলো না। নার্গিসকে ভুলতে পারেননি বলেই তিনি অগ্নিবীণা বাজাতে পেরেছিলেন। যে রচনার ঝংকারে ব্রিটিশ রাজের সিংহাসন কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন

'আমি মানব দানব দেবতার ভয়
বিশ্বের আমি চির দুর্জয় আমি জগদীশ্বর ঈশ্বর
-পুরুষোত্তম সত্য
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ পাতাল মর্ত্য!'

সত্যি পক্ষেও লাইনগুলো মিথ্যে আস্ফালন নয় তাকে ভয় পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক, তাঁকে ভয় পেয়েছে সামন্তবাদী পুঁজিবাদী মহাজন, তাকে ভয় পেয়েছে ঐ ধর্ম ব্যবসায়ী পুরোহিত ব্রাহ্মণ মোল্লার দল। ধর্ম ব্যবসায়ী শোষক শ্রেণি যুগে যুগে ধর্মের ছদ্মাবরণে মানুষকে শোষণ করেছে নির্যাতন করেছে বা এখনও করছে; যা হয়তো আমরা বুঝতেই পারি না। এই একবিংশ শতাব্দীতে নারী বলে তার অধিকার স্বীকার করা হয় না। যা সত্যি অমানবিক। নজরুল নারী কবিতায় নারীর পূর্ণ অধিকারের কথা বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়:

যে যুগ হয়েছে বাসি,
সে যুগে পুরুষ দাস ছিলো না'ক নারীরা ছিল দাসী
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে উল্কা বাজি।
(নারী/সাম্যবাদী)

কাজেই নজরুলের বিদ্রোহ বহুমাত্রিক বিষয় আসয় নিয়ে আবর্তিত হয়েছে, একটি বিশেষ জায়গায় তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার বিদ্রোহ সমাজ থেকে রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র থেকে ধর্মের নামে পাষাণ বেদীর তলে যে মিথ্যা গুণ্ডামী, যে পুরাতন মেকী তাকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তাকে অনুভব করেছেন বলেই সেটি দূর করে মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। গণমানুষের অধিকার যত দিন প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন তার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, তিনি বার বার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন আদর্শ রূপে চৈতন্য রূপে সে কথা তিনি অঙ্গীকার করেছেন আমাদের নিকট।

'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন: মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল আমি ধুমকেতু। (ধুমকেতু)

এই যে তার মানব সংসারে ফিরে আসা-এটি শারীরিক নয়, আদর্শগত চেতনাগত। মৃত্যুর পর আর কোনো মানুষ ফিরে আসতে পারে না, বা ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। তবে চিরায়ত আদর্শ বা চেতনায় কোন মৃত্যু নেই, যদি আমরা সেই চেতনা বা আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করে সমাজ তথা রাষ্ট্রে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানব কল্যাণ করে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারি। যেমন মহান কার্ল মার্কসের আদর্শ বাস্তবায়ন করে শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি সমতাভিত্তিক কল্যাণকর রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যা করেছিলেন রাশিয়ার এক মহান সিপাহশালার মহামতি লেলিন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। নজরুলের চেতনাও তেমনি একটি আদর্শিক বিপ্লব বা সমাজ পরিবর্তন করতে চাইলে তার বিপ্লবী আদর্শের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আর তখনি তিনি চেতনারূপে আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন আমাদেরকে। আর তখনই আমরা সকলে এক একজন নজরুল হয়ে সমাজ বিপ্লব বা রাষ্ট্র থেকে সকল অনাচার দূর করে মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। যেখানে সকল মানুষ সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে; কারো প্রতি কোনো অত্যাচার নিপীড়ন করতে পারবে না কোনো ধর্মের নামে, না কোন রাজনৈতিক নামে, এক কথায় একটি সমতাভিত্তিক সমাজ তথা রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণে তাঁরে সাহিত্য সংগ্রামের মৌল প্রেরণা। এ লক্ষ্যে তিনি রোমান্টিক স্বপ্নচারী কবি হওয়া সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অত্যাচার নিপীড়িন এবং অসংগতি তাকে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন আপোষহীন বিপ্লবী। যদিও বিদ্রোহী কবিতায় তার বিপ্লবী ও প্রেমিকসত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। তিনি কতটা প্রেমিক, কতটা বিপ্লবী যোদ্ধা, তা নির্ণয় করা অতীব কঠিন বিষয়। আর তিনি প্রেমিক বলেই বিপ্লবী হতে পেরেছেন; এ বিপ্লব মানসিক ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: মীথের অপূর্ব ব্যবহার

আধুনিক বাংলা কবিতায় মীথের ব্যবহার অনেক কবিই করেছেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর অমর মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্যে (১৮৬১) মহা ভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন এ কাব্য। তিনি ইউরোপীয় রেঁনেসাসে বিশ্বাসী হয়ে তার জীবন দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় জীবনবোধকে দেখেছেন। হিন্দু ভারতীয় হলেও ছিলেন বিশ্ব নাগরিক। মজার বিষয় হলো মধুসূদন দত্ত নিজ ধর্মকে অবজ্ঞা অবহেলা করেছিলেন পুরোপুরিভাবে। কিন্তু স্বধর্মীয় ঐতিহ্য-মীথকে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। কেননা একমাত্র মেঘনাদবধ কাব্যেই তিনি প্রাচীন মহা ভারতের কাহিনি বা হিন্দু ঐতিহ্যকে ধারণ করে মেঘনাদবধ মহাকাব্য রচনা করেন। যা প্রচলিত হিন্দু ধর্মমতকে পাশ কাটিয়েছেন। কারণ তাঁর কোন ধর্ম বোধ ছিল না। নীতিবোধও ছিলো না; এমন কি সমাজের ধারও ধারতেন না। একেবারে ভিন্ন ধাচের মানুষ হয়ে উঠেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি স্বেচ্ছায় স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মধুসূদন জীবন রচয়িতা শ্রী শশাঙ্কমোহন সেনের ধারণা; 'মধুসূদনের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বলতার ছিদ্রপথ ও কোমল দিক তার বিলাত গমনের আশার মধ্যেই ছিল।' সে যাই হোক মহা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মেঘনাদবধ মহাকাব্যে ইউরোপীয় জীবনবোধ, আধুনিক চিন্তা তার মহাকাব্যে স্থান দিয়েছেন; কাহিনি মহাভারতের হলেও মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের মহাকাব্য মেঘনাদবধের কয়েকটি চরণ উল্লেখ করতে চাই। এক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত যে বিদ্রোহী দেখিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

কি কহিলী বাসন্তি? পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্দুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ কূলবধু
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? (মেঘনাদ বধ কাব্য)

এ ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহের আবহটাই কাব্যকলারই বিদ্রোহ। মূলত মধুসূদনের বিদ্রোহ প্রচলিত বিশ্বাসবোধও শৃঙ্খলিত ছন্দমালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণের। এ ছন্দ নির্মাণের পাশাপাশি তিনি যে প্রাচীন ভারতের মীথের সার্থক ব্যবহার করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা কবিতায় সার্থক ট্রাজেডি নির্মাণেও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের চরিত্র জান কী পঞ্চবটে বন, বাসন্তি, দানব নন্দিনী (দানব কন্যা), রাক্ষস রাজা রাবণের পুত্র মেঘনাদ স্ত্রী, রাবণ (রাক্ষসের রাজা), মেঘনাদ (রাক্ষস রাজের পুত্র) প্রভৃতি মীথের ব্যবহার অপূর্ব বিন্যাস সাধন করেছেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভাষা ও বাক্য ব্যবহার মহাকাব্যিক আবহের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে 'আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?' এখানে ভিখারী রাঘব হচ্ছে প্রাচীন মহাভারতের রামচন্দ্র। রাম রাবণের কাহিনির রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অন্যদিকে যদি প্রাচীন ভারতের মীথের ব্যবহারের আরেক কবির উল্লেখ করি তবে, কবি জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯-১৯৫৪) কথা উল্লেখ করতে হবে। তিনি তাঁর বোধ ও চৈতন্যের মাঝে পাঠককে নিয়ে গেছেন আরেক প্রাচীন ভারতের অশোকের রাজ্যে। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশিথের অন্ধকারে হিমালয় সাগরে। অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে। (বনলতা সেন)
আবার তিনি তার মহাপৃথিবী কবিতায় কীভাবে মীথের ব্যবহার করেছেন দেখা যাক: জীবনানন্দ দাশ বলেন:

'জানে না সে কিছু, তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে যেতে
চীনের প্রাচীর বলে:
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে
যা কিছু নিভৃত-ধূসর-মেধাবী-তাহারে রক্ষা করে;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।'

আধুনিক বাংলা কবিতার উদগাতা (মহাপৃথিবী)

এভাবে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও প্রাচীন ভারতের মীথ ও প্রকৃতি চেতনার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভারতীয় মীথ প্রকৃতি নানাভাবে নানা রূপক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সার্থকতা লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় ধারার যুগ প্রবর্তক কবি প্রেম, প্রকৃতি ও দ্রোহ-চৈতন্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিশ্বমীথের ব্যবহারে একেবারে নতুন ও অভিনবত্ব এনেছেন। যা পূর্বাপর কোনো কবির সাথেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেই নজরুলের বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব মীথ ব্যবহারে।

বিদ্রোহী কবিতায় মীথের ব্যবহারে নজরুল যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অপূর্ব। যেখানে বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও কিছু মীথের অনুবাদ অসামান্য দক্ষতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু হিন্দু মুসলিম মীথ নয় গ্রীক মীথেরও সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। বেদপুরান কুরান ও বাইবেলের সহ সুফীবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। শুধু মীথ নয়; বিদেশী শব্দের সার্থক প্রয়োগ বিদ্রোহী কবিতায় নতুন মাত্রা দিয়েছে। গ্রীক পুরানের হোমারের ইলিয়াড ওডিসি, প্রাচীন ভারতের রামায়ন মহাভারত বেদ-উপনিষদ ভাগবত গীতা ছাড়া ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে মীথের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্ব মীথের ব্যবহারে নজরুলের একটি সমন্বয় ধর্মী মানসিকতা কাজ করছে। সম্ভবত সমকালীন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও স্বদেশ চেতনামূলক জাগরণ ঘটানো এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বিপ্লবীদের পুনর্জীবন ঘটানোই মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তবে, বিদ্রোহী

কবিতায় ভারতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যে রেনেসাঁসের জন্ম দিয়েছে, তা বলার অবকাশ রাখে না।

বিদ্রোহী কবিতায় সবচেয়ে হিন্দু পুরাণ বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু দেবতা শিবের উপমা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নামেও শিবের বন্দনা গীতি করা হয়েছে। শিব কখনো নটরাজ, মহাদেব, নটেশ্বর, ঈশান, ত্রিলোচন, এম্বক, ধূর্জটি, বিরু পক্ষে ব্যোমকেশ, পিনাকপাণি, মর্তহের, শিবশম্ভু এক কথায় ধ্বংসের দেবতা রূপে উপনামে অভিহিত করা হয়েছে, যা মহাভারতের কাহিনিতে রয়েছে। শিব ছাড়া রুদ্র, বিশ্বামিত্র, বিষ্ণু, দ্বাদশ রবি, পরশুরাম, বলরাম, ভৃগু, ইন্দ্রানী, বাসুকি, শনি, রাহুগ্রাস, ধর্মরাজ, ঈশান, উমেদাগ্ন, পূর্বাশা, ছিন্নমস্তাচণ্ডি, চক্র মহাশিঙ্খ, ত্রিশূল, পিনাকপাণী, সন্ন্যাসী, কৃষ্ণ কণ্ঠ, মন্থন, শ্মশান, সাগ্নিক, রুদ্র ভগবান, যজ্ঞ, পুরোহিত, ব্যোমকেশ, ক্ষ্যাপা-দুর্বাশা, বৈজয়ন্তী, কালনেল, দেবশিশু, শ্যামের হাতের বাঁশরি, রণদা সর্বনাশী, স্বর্গ পাতাল মর্ত্য। আবার গ্রীক পুরাণে যে মীথের ব্যবহার হয়েছে তাকেও নজরুল খুব সহজেই বিদ্রোহী কবিতার রূপক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় তুলে এনেছেন। কবি বলেছেন–

'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি,
মহাসিন্ধু উতালা ঘুম ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম।' (বিদ্রোহী)

এখানে একটি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন যে, গ্রীক মহাকাব্যের এক কিংবদন্তী বীর গ্রীকমীথ অনুসারে যার নাম অর্ফিয়াস, দেবী এ্যাপোলো তাকে বর হিসেবে এক বীণা বাদ্যযন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। সেই আশ্চর্য অলৌকিক যাদুকরী বীণার সুর ঝংকারে মৃত মানুষও আবার জীবিত হয়ে উঠতো বলে মহাকাব্যে বর্ণিত আছে। নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় রূপক হিসেবে পরাধীন ভারতের দেশপ্রেমিক বীর জনতাকে স্বাধীনতার মন্ত্রে আবার উজ্জীবিত করতে অর্ফিয়াসের বাঁশি হাতে ডাক দিয়েছেন। আবার প্রাচীন ভারতীয় মীথ হিন্দু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত গোপিনী নিয়ে যে লীলামগ্ন থাকতেন। আর তার হাতে যে অলৌকিক বাদ্যযন্ত্র থাকতো, তা ছিলো বাঁশের বাঁশি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিতে ফুৎকার দিলে তার প্রেমিকা রাধিকাসহ তাঁর গোপিনীগণ দল বেঁধে চলে আসতো। তার সেই বৃন্দাবন ধামে তাদের লীলা মাহাত্ম্য চলতে থাকতো। বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল সেই রোমান্টিক দৃশ্যপটকে প্রেমিক সত্তায় তুলে ধরেছেন এভাবে।

'মম বাঁশরির তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি।' (বিদ্রোহী)

মহাভারতের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে তিনি মীথের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। এখানে মীথ রচনার পাশাপাশি তার প্রেমিক সত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

'আমি অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড় চিত-চুম্বন, চোর-কম্পন, আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন;
আমি চপলা মেয়ের ভালোবাসা, তাঁর কাঁকন চুড়ির কনকন।'

আবার মুসলিম মীথের ব্যবহারেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে বিদ্রোহী কবিতায়। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহার কবিতাটিকে অতি উচ্চ মার্গে নিয়ে গেছে। বিশ্ব মীথের সাথে মুসলিম মীথের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে কবিতাটিতে। কবি বলেন,

'বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক-দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময়, আমি বিশ্ব বিধাতৃর। (বিদ্রোহী)

তিনি আরো বলেছেন,

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ
আমি ইসরাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার।'

আরবের বেদুঈন জাতি অসীম সাহসী, তারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, কোন পরাভব মানে না, আর মঙ্গলীয় বংশোদ্ভুত বিশ্বখ্যাত বীর যোদ্ধ চেঙ্গিস খানকে সাহসের প্রতীক হিসেবে মুসলিম বীরত্বগাঁথা হিসেবেও চিত্রিত করে পরাধীন ব্রিটিশ ভারতের উত্থান কামনা করেছেন। দেশাত্মবোধকে উজ্জীবিত করার মানসলোক প্রকট আকারে দেখা যায় তার মীথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। মীথ ব্যবহারে এই যে তার একই বাক্য অর্থ ব্যবহার সমন্বয়কারী ম্যাজিক প্রয়াস যা সত্যি অপূর্ব। সামাজিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রয়াসী কবি তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

'ধরি বাসুকির ফণা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'
আমি দেবশিশু, আমি চঞ্চল।
আমি ধৃষ্ট আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।'
(বিদ্রোহী)

আবার কবি প্রচণ্ড অমিত বিক্রম তেজ ও সাহসিকতার উল্লাসে দেশ ও জাতির কল্যাণে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আর তা যদি মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায় তাতেও কবির কোনো দুঃখ বা খেদ নেই, কবি তাই নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারেন;

'আমি তাই করি ভাই, যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।' (বিদ্রোহী)

শুধু প্রচণ্ড সাহস, অমিত বিক্রম তেজই নয়; প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কবি, নিজের প্রতি, নিজের চেতনার যে বোধ তার প্রকাশও বিদ্রোহী কবিতা। কবিতার পরতে পরতে জীবন বিশ্বাস; আত্মবিশ্বাস, আত্মদর্শন, সুফীবাদ সকলই যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়েছে; শুধু উপলব্ধি মাত্র, শুধু বোধোদয় মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ জগত সংসারের অধিকাংশ সাধারণ মানুষই নজরুল মানস অনুধাবন করতে, বিশেষ করে নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর মানস স্বরূপ বুঝতে অপারগ। নজরুল বলেন,

জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি, পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গপাতাল মর্ত্য। (বিদ্রোহী)

পরম করুণাময় স্রষ্টা যাকে ইচ্ছা তার রহমত দান করেন, ক্ষমতা দান করেন, সে পথ পায় তাকে দেখতে পায়, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই সত্য। আর তিনি স্বর্গ পাতাল মর্ত্য সকল বিষয় তার নখদর্পণে উক্ত আলোচ্য লাইন দুটিতে তা সুস্পষ্টরূপে নজরুল বলতে প্রয়াসী হয়েছেন। যারা এই রহমত প্রাপ্ত তারাই মহাপুরুষ, সত্য তাঁর কাছেই অবারিত তিনি সব দেখতে পান। স্বর্গ পাতাল মর্ত্য তিনি মন্থন করতে পারেন শিব যা করেছিলেন। তিনি প্রতীকের ব্যবহারে বিশ্ব নবী (স.) এর স্বর্গ (জান্নাত) মর্ত্য পৃথিবী পাতাল নরক সকল কিছু করুণাময় অবলোকন করিয়েছেন। সেটি বলতে প্রয়াসী হয়েছেন। শুধু তাই নয় একটি কবিতায় এমন করে মীথের সার্থক ব্যবহার অন্য কোন কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এখানেই তার সার্থকতা।

তাই নয় প্রবল আত্মবিশ্বাসী পরম করুণাময় আল্লাহর প্রেমিকগণ বেহেশত দোযখ-এর ধার ধারেন না। তাদের যেখানে দেয়া হবে তারা সেখানেই হৃষ্টচিত্তে থাকবেন, শুধু পরম করুণাময়ের সাক্ষাৎ পেলেই হলো। সেই প্রবল আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছে বিদ্রোহী কবিতায়

'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' (বিদ্রোহী)

এখানে ইরানের সুফীবাদ বিশেষভাবে মহাকবি ওমর খৈয়ামের প্রভাব নজরুল মানসকে প্রভাবিত করেছে। পারস্য সুফীবাদের দর্শন, এক উদার মানবিক মানস চেতনা তৈরী করেছে বিদ্রোহী কবিতায়। বিদ্রোহী কবিতায় মীথের ব্যবহার শুধু মীথের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বিশ্ব মানব দর্শনে রূপায়িত হয়েছে, যেখানে মানুষই সব বাকী সব মিথ্যে সকলই ফাঁকি। বিদ্রোহী কবিতায় বিচিত্র মীথের ব্যবহার করা হয়েছে; যেন বিশ্বের সকল সংস্কৃতি একটি সুঁতোয় একটি মালায় গেঁথেছেন কবি।

সেখানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একটি প্রতীকি ব্যঞ্জনা মাত্র, আসলে তা শোষকের বিরুদ্ধে এক যৌথ মানবিক মিছিলের সমষ্টি। শুধু একক শক্তি নয়; সম্মিলিত প্রয়াসের বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মীথের ব্যবহার সেই মহা অভিযানের নির্দেশিকার দিক নির্দেশ করে বিদ্রোহী। যা শুধু একশ বছরের আগের নয় সর্বকালের সর্বমানবের এ বিদ্রোহ।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: বিশ্বের নিপীড়িত গণ-মানুষের মুক্তির মহাকাব্য

যুগে যুগে গণবিপ্লব ও গণস্বাধীনতা সংগ্রামে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, লেখকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কি, বরিসপাস্তেরনাক, ভিক্টর আগো, দস্তয়ভস্কি, নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা, রিলকে, এজরা পাউন্ড, রবার্টফ্রস্ট, কমরেড মাওসেতুং, লিওপোল্ড র‍্যাংকে প্রমুখ মহামনীষী লেখকগণ রয়েছেন আরো কতজন থাকতে পারেন কিন্তু কাজী নজরুর ইসলামের মত এত রাজনৈতিক নিগৃহের শিকার কাউকেই হতে হয়নি। প্রগতিশীল ধারার মানবতাবাদী প্রতিটি লেখক রাজনীতি সচেতন ও যুগের দাবীকে লেখায় ধারণ করে গণমানুষের মুক্তির প্রয়াসী হন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নজরুল তার কাব্য সাধনাকে অতি সহজেই ব্রিটিশ ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লবী আন্দোলনে শামিল করে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নতুন কবিতা গানে নতুন ছন্দে নিজের কবি সত্তাকে তিনি সমুজ্জ্বল করে তুললেন। গণমানুষের মুক্তির প্রয়াসকে শাসকের শোষণের কাহিনিকে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখকে ক্ষোভ বিক্ষোভকে বহুমুখী চিত্রাঙ্কণে সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লব মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও গণমানুষের অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। এদিক থেকে ফরাসি লেখক ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) সাথে নজরুলের তুলনা করা যায়। রুশো ভল্টেয়ারের সাহিত্য দর্শন ফরাসি জনসাধারণকে যেভাবে প্রেরণা দিয়েছিলো, নজরুলের লেখাও তেমনি ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে বিপ্লবের শক্তি যুগিয়েছিল।

ফরাসি লেখক ভল্টেয়ার রুশোর জোরালো লিখায় ফরাসি হয় বিপ্লবের মাত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তাদের যাদুকরী লেখায় ফরাসি জনতাকে বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। ফরাসি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র উৎখাত করার প্রবলশক্তি দিয়েছিল এজন্যই তাঁকে বলা হতো 'The Magiuan of the art of writing' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ তাদের দোসররা এদেশে তাদের দমন পীড়ন, আরো বাড়িয়ে দিয়ে শাসন শোষণ পাকাপোক্ত করে। যার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ শাসক সিপাহী বিপ্লবের পরে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময় ঘনিয়ে আসছে ভেবে ব্রিটিশ শাসক সরাসরি মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন জারী করেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবাধ লুটপাট ও শোষণের নিপীড়নের ফলে ভারতের প্রজাকুল অতিষ্ট হয়ে উঠে। একদিকে ব্রিটিশের শাসন শোষণ অন্যদিকে তাদের পদলেহি সামন্ত প্রভুদের খাজনা বৃদ্ধির জুলুম নিপীড়ন শাখের করাতের মত কাটতে থাকে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে হিন্দু মুসলিমদের দাবীনামা জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ

ব্যর্থ হলেও তার রক্তঝরা পথ ভারতীয়গণ ভুলে যায়নি। যার প্রেক্ষপটে ভারতে নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, শহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সশস্ত্র যুদ্ধ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির মজনুশাহর নেতৃত্বে ফকির বিদ্রোহ, হাজী শরিয়াতুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে ভারতে খেলাফত আন্দোলন অন্যতম। শুধু তাই নয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেম সমাজের শাহাদত বরণ ও ভূমিকা খাটো করে দেখার মত নয়। এভাবে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) দানা বেঁধে উঠে। ভারতীয়গণ স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রলোভনে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। যারা মূলত মিত্রবাহিনীর হয়ে হিটলারের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করতে থাকেন। ফলে ভারতীয়গণ বুঝতে পারেন ব্রিটিশ বাহিনীর রাজনৈতিক প্রতারণা। তাই ভারতীয় প্রজাকুল সিপাহী বিপ্লবের তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সেই রক্তঝরা পথেই তাদের মুক্তির বীজ নিহিত রয়েছে বলে ভাবতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে নানারূপ জনস্বার্থ বিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী আইন করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, জুলুম নিপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের জুলুম নিপীড়নের প্রতিবাদে প্রতিটি রাজ্যে, জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভা মিছিল মিটিং চলতে থাকে। গঠিত হয়ে যায় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন; অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি, নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদী ফৌজসহ আরো অনেক সংগঠন।

যাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে ভারত মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী হামলা, যেমন ব্রিটিশের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে হামলা, থানায় হামলা, ব্রিটিশের বিভিন্ন অস্ত্রাগারে হামলা পরিচালনা করে বিপ্লবীগণ বুঝিয়ে দিতে চান যে, তাদের শাসন আর ভারতীয়গণ মানতে নারাজ। বাংলায় ব্রিটিশের ভিত কাঁপিয়ে দেয়, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনও হামলা। এভাবে যখন ব্রিটিশের শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব, তিতুমীরের সশস্ত্র যুদ্ধ, ফকির মজনুশাহ সশস্ত্রযুদ্ধ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহী, নীল বিদ্রোহের পর মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, অভিরাম, প্রীতিলতার আত্মত্যাগের পথ একই স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে। আর তা হলো ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। কুড়ির দশকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই হামলা আরো জোরদার হতে থাকে। ফলে ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য বাহিনীও মরিয়া হয়ে উঠে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে একটি গণজমায়েত জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে গুলি চালিয়ে শতাধিক প্রজাসাধারণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ ফুসে উঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন ও বড় লাটের কাছে এক প্রতিবাদলিপি পাঠান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে, আবার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তা রদ হলেও মূলত সকল আন্দোলনই ভারতমাতার মুক্তি আন্দোলনের সূত্রে গ্রথিত। কুড়ির দশকে একটি বিপ্লবী চেতনা সাহিত্য শিল্পে লক্ষ্য করা যায়। সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতের গ্লানি, ব্রিটিশ সরকারের জুলুম নিপীড়ন নজরুলের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠে। মূলত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই স্বদেশী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বীজ নিহিত। বিলেতি পণ্য বর্জন চরকার মাধ্যমে নিজেদের পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। হিন্দু মুসলিম সমাজে স্বদেশপ্রেম দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ বন্দে মাতরম ধ্বনিতে রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটাতে থাকেন।

অন্যদিকে মুসলিমগণ আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে তাদের রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটাতে থাকেন। যদিও সকলের লক্ষ্য ভারতীয় স্বাধীনতা জাতীয় মুক্তি; কিন্তু ধর্মীয় চেতনা হিন্দু মুসলিম কেহই ভুলে থাকতে পারেননি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় যুগসন্ধিক্ষণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

'এত দিনে বুঝেছে বাঙালী
দ্রোহে তার আজো আছে প্রাণ
এ জগতে যোগ্য যারা তাদেরই মাঝে
আমরাও করে নেব স্থান
যে যারা টিটকারী দিক অন্তরে বুঝেছি ঠিক
এ কেবল নহে কো হুজুক সন্ধিক্ষণে আজিবাদ, এল নব যুগ।' (সন্ধিক্ষণ)

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব নজরুলের প্রখ্যাত উপন্যাস কুহেলিকায় দেখতে পাওয়া যায়। নজরুল রানীগঞ্জ সিয়ারশোল হাই স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল যুগান্তর সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে নজরুলের স্কুল শিক্ষক শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘটকের দ্বারা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই বিপ্লবী চেতনা নজরুলের অসংখ্য কবিতা গানে উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীগণ বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশের থানা পুলিশ স্টেশন প্রশাসনিক দপ্তরে হামলা চালাতে থাকেন। এদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। তখন এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী চেতনাই সর্ব ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র পথ বলে বিবেচিত হতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানীতে অধ্যয়নরত ভারতের একদল ছাত্র ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট লীগ (১৯১৪) ব্রিটেন জার্মানি বিরোধ হওয়াতে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীগণ জার্মানির সহায়তায় ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কানাডায় গড়ে উঠে গদরপার্টি। আর এভাবেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নানা বাঁক বদল করতে থাকে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব নজরুলের কবিতায় বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। যদিও তার গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রভাব ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রভাব একেবারে কম নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তের বর্ণনা পাওয়া যায় নজরুলের ছোট গল্প হেনায়।

'ও কি আগুন বৃষ্টি। কি তার ভয়ানক শব্দ! দ্রুম দ্রুম দ্রুম। আকাশের একটু নীলও দেখা যাচ্ছে না। যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে আছে। গোলা আর বোমা ফেঁটে ফেঁটে আগুনের ফিনকি এতো ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অতঘন জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে তাহলে সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেতো।' (ছোট গল্পঃ হেনা)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নজরুলের ভূমিকা দেশের অপরাপর কবি সাহিত্যিকদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া তার বলাকা কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার বলাকা কাব্যের প্রভাব নজরুলে এসেছে। আবার ইংরেজি সাহিত্যে যে প্রভাব তাও নজরুলে প্রত্যক্ষ করা যায়। যুদ্ধ সংঘাত, ক্ষোভ-বিক্ষোভের মাঝে রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্য দিয়ে সমকালীন যুগের দাবী তুলে ধরেছেন তিনি। নতুন যুগ ও সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে মুখর তার কবিতা ও সাহিত্যকর্ম। আর সেদিক থেকে নজরুল বাঙালির প্রথম জাগরণের কবি। নজরুলের সেই জাগরণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তার যুগবাণী প্রবন্ধে।

রুশিয়া বলিল মারো অত্যাচারীকে; ওরাও স্বাধীনতা বিরোধীর শির। ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে। আল্লাহ আকবর বলিয়া তুর্কী সাড়া দিলো। তার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত কৃষ্ণ শিখফৌজের রক্তবর্ণ স্বাধীনতা প্রহরীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করি।

আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এমন সময় ভারত জাগিল। (যুগবাণী)।

নজরুল যে বিপ্লবের আদর্শে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তার মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে পাওয়া যায়। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের মূল বক্তব্যই হচ্ছে রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্তি পেতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এক দল কর্মী রুশ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দল পরিবর্তন করেন। আর সেটিই মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজ যদি রুশ বিপ্লবে সাড়া না দিতো তাহলে এমন বিপ্লব সংঘটিত হতে পারতো না। আর মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে আনসার চরিত্রের মধ্যে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়।

'তোমাদের মৃতদেহের উপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ করো না, যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয়, তবে তোমরাই জয়ী হবে। আর অস্ত্র বানাই বলবো কেন? কোচোয়ান তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে চাবুক মেরে শায়েস্তা কর; আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না।' রাজমিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, মেথরদের উদ্দেশ্য করেও আনসার বারবার বক্তব্য প্রদান করেছে। যা সমকালীন সমাজ বিপ্লবের মতই কথা বলেছে। মার্কসের দর্শন পৃথিবীতে কৃষক শ্রমিক মুটে মজুরসহ সর্বহারা মেহনতি মানুষের হৃদয়ে নতুন আশা ও নতুন স্বপ্নের বীজ বপন করলো। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণির পতন ঘটিয়ে মেহনতি মানুষের জন্য একটি শোষণহীন সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা কেবল রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকলো না, ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষে। নজরুল যে বিপ্লবী চেতনা মন-মানসে ধারণ করেছিলেন তার অসংখ্য চিত্র দেখানো হতে পারে তার কাব্য সাহিত্যে প্রবন্ধে। আর বিপ্লবী চেতনাকে নানা কবিতা উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে রূপায়িত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার সেবক কবিতায় 'সত্যমুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের দেশের তরে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের সত্য মুক্তি জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।' (সেবক)

কবি সেবক কবিতাটি হুগলী জেলে বসে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন বন্দী জীবনের যে বিষ ভরালো, যে তিক্ততা যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। তবে কবিতাটিতে সে সময়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হতাশা নৈরাজ্য ফুটে উঠেছে। যদিও নজরুল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা অমিত বিক্রম তেজি এক মহান কবি পুরুষ। তিনি শুধু শুধু কবিতার ভাষায় বিদ্রোহ করেননি; তার অসংখ্য নিবন্ধ প্রবন্ধে করেছেন। তার রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, যুগবাণী, নবযুগ-গণবাণী, যা তার ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি। নজরুল প্রকৃত পক্ষেই চিন্তা চেতনা ও মনমানসে জাত বিদ্রোহী। দেশকে ভালোবেসে দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে, বিশেষত কৃষক শ্রমিক মুটে মজুর তাঁতী জেলেসহ সর্বহারা অসহায় মানুষগুলোর প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ, তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নজরুলের কবিতা গানের মৌল প্রেরণা। শুধু তাই নয়, তার প্রবন্ধ, তার পত্রিকা ধূমকেতুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ সম্পাদকীয়, রাজনৈতিক কলাম প্রভৃতিতে লেখনী বিপ্লবী চেতনায় ভরপুর। কবি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি বিপ্লবী আবহ ধারণ করেছিলো। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় মেহনতি শ্রমিক কৃষকের বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব, তুরস্কে কামাল আতার্তুকের নেতৃত্বে তুর্কী বিপ্লব, আইরিশ বিদ্রোহ, ইংল্যান্ডে কারখানায় শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহ ধূমকেতুর প্রকাশের আদর্শ হয়ে উঠে। ফলে ভারতের বিপ্লবীদের আস্থায় পরিণত হয়ে যায় ধূমকেতু, যা প্রকাশের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়। মূলত ধূমকেতু পত্রিকা মার্কসবাদী আদর্শ প্রচারের এক মাধ্যম হয়ে উঠে। নজরুল ইসলাম যে পুরোমাত্রায় মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রমাণ রুদ্র মঙ্গল নামক প্রবন্ধ পত্রিকায় লিখিত সম্পাদকীয়, যা পরে প্রবন্ধ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। যেখানে নজরুল কৃষক শ্রমিক মেহনতি শ্রেণির দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন, সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানান। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ

মার্কসবাদী চেতনা সমৃদ্ধি কলাম দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে লিখতে থাকলেন। নজরুলের ধূমকেতু পত্রিকা মূলত তার বিদ্রোহী কবিতার আরেক বিস্তৃত প্রসারিত রূপ। কারণ বিদ্রোহী কবিতা ও ধূমকেতু পত্রিকার আদর্শ এক অভিন্ন; ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতার মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তি নিপীড়িত মানুষের রাজত্ব কায়েম করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত ও সামন্তবাদ, পুঁজিবাদী শোষণের মূল উৎপাটন নজরুল সাহিত্যের মৌল প্রেরণা।

বিদ্রোহী কবিতার পরতে পরতে শোষিত নিপীড়িত বঞ্চিত গণ মানুষের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ খেতে না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, সেখানে যক্ষের ধন সঞ্চয় করে মানুষের রক্ত শোষণ করে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাষাণপুরি সম প্রাসাদ তৈরি করেছে আর ভোগ বিলাসে মত্ত; আর যাতে মানুষ কোন প্রতিবাদ না করতে পারে, তার জন্য আইনের পর আইন তৈরি করে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। যুগে যুগে মানুষের পায়ে শৃঙ্খল পরানোর এই প্রবণতা প্রতিটি স্বৈরশাসকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রতিটি দেশের মানুষ যুগে যুগেই তার প্রতিবাদ করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রতি প্রকাশ্যে নজরুল বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন,

'আমি মানি না'ক কোন আইন,
আমি ভরাতরী করি ভরাডুবি,
আমি টর্পেডো ভীম ভাসমান মাইন'

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, বিলেতী পণ্য বর্জনে, ভারতীয়গণের এই অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অসহায় হয়ে পড়ে এক পর্যায়ে গান্ধী আরডইন চুক্তির কালে নজরুলসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতেই থাকে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন থামাতে বিপ্লবীদের ধরে ধরে ফাঁসি দিতে থাকে, কাউকে দ্বীপান্তর দিতে থাকে। তারা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ভারতীয়দের স্তব্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু তারা জানে না একটি জাতি যখন মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে যায়, তখন তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তখন সমগ্র জাতির মুক্তির ভাষা হয়ে যায় আরো ক্ষুরধার, তেজোদীপ্ত অগ্নিউদ্দীপক নজরুলের ভাষায়;

'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার;
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহান....
(বিদ্রোহী)

ক্ষত্রিয় বংশের লোকেরা যে সাধারণ মানুষকে অত্যাচার নিপীড়ন করতো, তাদের নির্যাতন করে তাদের ধ্বংস সাধন করে কবি পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন, শুধু তাই নয়; কবি অধীন বিশ্বকে পরাধীন বিশ্বকেও মুক্তির আস্বাদ দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। নতুন সৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেখানে ধনী আরো পাহাড়সম সম্পদের মালিক হবে না, দরিদ্র আরো দরিদ্র হবে না, ক্ষুধার্ত শিশুর রক্ত পান করে শোষক শ্রেণি তাদের টাকার সিন্দুক ভরবে না, কবির ভাষায়

'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় দুটো ভাত, একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়
কেঁদে বলি ওগো ভগবান তুমি আজিও আছো কি? কালি ও চুন কেন উঠে
না'ক তাদের গালে, যারা কেড়ে খায় শিশুর খুন?'
(আমার কৈফিয়ত)

ঘরে ক্ষুধার্ত অসুস্থ শিশু খাবার নেই, ওষুধ পথ্য নেই কোন সাহায্য সহযোগিতা নেই; অথচ কোটি কোটি টাকার বিলাস ব্যাসন, খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর পুঁজিপতি মহাজনের ঘরে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তুপের মত পড়ে আছে। এই অসম সমাজ ব্যবস্থা ভাঙার যে গান, যে নতুন সমাজ রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি যে নাটভূমি তাকে কোনো অবস্থাতেই নজরুল উপেক্ষা করতে পারেননি। বিক্ষুব্ধ চিত্তে হৃদয় ভারাক্রান্ত চিত্তে কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন।

'বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালাটা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা
তাই লিখে যাই এ-রক্ত লেখা
বড় কথা, বড় ভাব, আসে না'ক মাথায়, বন্ধু বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু, যাহারা আছো সুখে।
(আমার কৈফিয়ত)

কবিতায় ধনাঢ্য সুখী বন্ধু ও সমাজ ব্যবস্থার এই অসঙ্গতি বৈষম্য দর্শনে মর্মাহত হয়েছেন, তাই তার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা, হৃদয় নিংড়ানো বেদনাবোধের কথা বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। সখী বন্ধুদের অমর কাব্য মহাকাব্য লিখতে অভিমানী চিত্তে বলেছেন, যা শুধু তার নিজের কথা নয়। গোটা দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর কথা, পরাধীন ভারতের হত দরিদ্র সমাজ চিত্রের কথা।

নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি যেমন দাবী দাওয়া চলছে,এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসক নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল অনড়। কোন ভাবেই যেন শুনছে না গণমানুষের মুক্তির দাবী মুক্তির ফরিয়াদ। তখন কবি বিক্ষুব্ধ হয়ে চরম ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তিনি বলেছেন,

লাথি মার ভাঙরে তালা যতসব বন্দী শালায়
আগুন-জ্বালা, আগুন-জ্বালা ফেল উপাড়ি। (শিকল ভাঙার গান)
আবার বিদ্রোহী কবিতায় রূপকের আশ্রয়ে কবি বলেছেন

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন
আমি স্রষ্টা সূজন শোকতাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।'
(বিদ্রোহী)

এখানে কবি ভারতীয় মীথের আশ্রয়ে সাধক ভৃগুর উপমা ব্যবহার করেছেন। ভগবান বিষ্ণুর একান্ত ভক্ত সাধক ভৃগু তার উপাসক বিষ্ণুকে অনেক ডাকার পরও যখন বিষ্ণু ভক্তের ডাকে সাড়া দেয় না তখন বিক্ষুব্ধ ভৃগু তার আরাধ্য দেবতার বুকে লাথি মেরে তাকে জাগাতে চেয়েছেন।

এই রূপক প্রতীক ব্যবহার করে কবি নজরুল ভারতের উদাসীন শাসক গোষ্ঠীকে ভারতের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় শুধু বিক্ষুব্ধ নয়; পুরো বিপ্লব ছড়িয়ে আছে, যে বিপ্লবী চেতনা ভারতীয়দের মানস এক সঞ্জিবনী সুধার মত কাজ করেছে। যাকে কোনোক্রমেই খাটো করে দেখা যাবে না। সকল বিপ্লবীর সাথে তার আত্মার সখ্য গড়ে ওঠে। তাইতো কবি বলেছেন:

'যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে, অমূলে নেন! আর কিছু শুনেছো কি হুঁ হুঁ ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?'
(আমার কৈফিয়ত)

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে, মেহনতি শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আন্দোলনে তিনি যে সকল বিপ্লবী ছিলেন, যুগান্তর সমিতি, অনুশীলন সমিতিসহ আরো যারা দেশমাতৃকা মুক্তির সংগ্রামে নিজেরা নিয়োজিত করেন তিনি তাদের দলেরই একজন ছিলেন। যার প্রমাণ তাঁর কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া, রাজবিদ্রোহী হিসেবে তাঁর কারানির্যাতন ভোগ ও মুক্তি লাভ। এ সকল তার মেহনতি কৃষক শ্রমিকসহ নির্যাতিত গণ মানুষের ভাত কাপড় সকল নাগরিক মৌলিক মানবিক প্রয়োজনসহ রাজনৈতিক অধিকার ও মুক্তির আন্দোলনের সাথে বিপ্লবের মাধ্যমে সরাসরি মুক্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বের নির্যাতিত গণ মানুষের শির লক্ষ্যে তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে হলেও তাতে বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। কবি বলেছেন–

'পরোয়া করি না, বাঁচি না বাঁচি, যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো– যারা কেড়ে খায়, তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয়, আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।'
(আমার কৈফিয়ত)

প্রায় দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান কল্পে কবি, ভারতীয় শত শত বিপ্লবীদের কথা বলেছেন। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের কথা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেছেন তিনি মাথার উপরে রবি হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন– বিপ্লবীদের পথনির্দেশ করেছেন, বিপ্লবীরা বিপথগামী হবে না। তিনি আরো বলেন, যে শাসক শোষক হয়ে নিপীড়ন করে তেত্রিশ কোটি জনতার মুখের গ্রাস হরণ করে তাদের অধিকার হরণ করেন, কবির লেখার মাঝে কবির বুকের তাজা রক্তের মাঝেও যদি তাদের ধ্বংস সাধন হয়, তাদের পতন সাধিত হয় তবে কবি তাতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। জাতীয় মুক্তির যে বিপ্লব তাতে অকাতরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শান্ত হবেন, তার আগে নয়। আর ততদিন তার সংগ্রাম চলছেই। জনতার স্বার্থে।
কবি বলেছেন,

'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব!' (বিদ্রোহী)

এই যে তাঁর নিপীড়িত মানুষের পক্ষে অবিরত সংগ্রামের প্রত্যয় শোষকের শোষণ অত্যাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, গণ মানুষের কান্নার রোল আকাশে বাতাসে থামবে না ততদিন তিনি তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন- এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। কবির প্রতিশ্রুতি একটি সার্বজনীন আদর্শিক ঘোষণা, যা সর্বকালীন আবহ নিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি গণমানুষের মুক্তি পথের দিশারী হয়ে আছে। যদি বিদ্রোহী কবিতার আদর্শ চেতনার কাছে ফিরে যাবে; তবে অবশ্যই যে কোনো জাতি তাদের ক্রান্তিকালের জাতীয় দুর্ভোগে মুক্তির উৎস খুঁজে পাবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কারণ, বিদ্রোহী কবিতা শুধু একটি কবিতা নয়; বিশ্বের নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তির এক মহাকাব্য।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ব্যক্তিত্ববাদের চরম উল্লাস

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক কালজয়ী কবি প্রতিভা। তার আগমনে বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে তার জন্ম ব্রিটিশ জ্বালার মত তাকে দহন করেছে। ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিলো। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ গণ মানুষকে সমানভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল যে মুক্তির কোন উপায়ই ছিলো না। এদিকে ভারতের হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের পদলেহনে ব্যস্ত। সামন্ত প্রভুগণ রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর খেতাব আদায়ে প্রভুর পদ সেবায় মনোরঞ্জনের প্রয়াসী, অন্যদিকে সুদখোর মহাজন বণিক শ্রেণি অর্থ আদায়ে ব্যস্ত। করের বোঝা বাড়াতে বাড়াতে প্রজা সাধারণের জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। এমনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তিনি বাংলা সাহিত্যে এসেই বললেন,

'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন. মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি, মহাকাল, আমি ধূমকেতু।' (ধূমকেতু)

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত হলেন। এই ক্ষয়িষ্ণু, ভঙ্গুর সমাজ ভেঙে তিনি একটি নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। আর যখন স্বপ্ন ভঙ্গ হলো একটি সুখি সুন্দর সমাজ হবে, সেখানে দুঃখ দরিদ্র অভাব অনটন থাকবে না, থাকবে না শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নির্যাতন। স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ তাকে আহত করেছে, পীড়িত করেছে। তখন তিনি ঘুণে ধরা সমাজ ভেঙে চুরমার করতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বললেন স্বদেশবাসীকে। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,

'বল বীর বল চির উন্নত মমশির
শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির'

দেশবাসীকে সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করতে গিয়ে তিনি নিজেও জেগে উঠলেন, নিজের অবদমিত মস্তককে সোজা করে হিমালয় চূড়ার মত উঁচু করে দাঁড়ালেন। কারণ যিনি বলবেন তাকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হবে। নেতৃত্ব দিতে গেলে নিজেকে সামনে দাঁড়াতে হবে। নজরুলও তাই করলেন, তিনি প্রথমে জাতির ক্রান্তিকাল বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন,

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

অসহায় ভারতবাসীর করুণ অবস্থা দেখে নজরুল পীড়িত হলেন, সে অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন,

'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ
হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন।
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'
(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

এই যখন দেশের অবস্থা, দেশের মানুষকে উদ্ধার করতে হবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে। সেখানে কোন হিন্দু সৈনিক এই বিষয় বিচার করা যাবে না। সে মায়ের সন্তান মানব সন্তান, এটিই তাঁর বড় পরিচয়। দেশ দেশের মানুষকে উদ্ধার করতে জাগাতে কবি বলে উঠলেন,

'বল বীর, বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর
বল বীর আমি চির উন্নত শির।' (বিদ্রোহী)

মানব মুক্তির জন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করার জন্য সবই চাঁদ সূর্য তারা এমন কি মহাকাশ, খোদার আসন ছিন্ন করার কথাও বলিষ্ঠ কণ্ঠে, তেজোদীপ্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে তার মানস ব্যক্তিত্ব একাকার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে আর তিনি তার মত করেই সকল কিছু বলার প্রয়াসী হয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে তিনি প্রকাশ্যে আইন অমান্য করতে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে বলেন,

আমি মানি না'ক কোন আইন
আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন। ' (বিদ্রোহী)

দেশবাসী, দেশের মানুষ, তাদের স্বাধীনতা মুক্তির জন্য নজরুল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি আইন ভাঙার যে প্রকাশ্য ঘোষণা তা শুধু শুধু নয়। তিনি ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে বসলেন। এটি তার স্বদেশপ্রেম, মানব মুক্তি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ প্রমাণ। যখন কোন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবী করতে সাহস পাচ্ছে না তখন নজরুলের এই আইন অমান্য করার সাহস বলিষ্ঠতা বিস্ময়কর বটে। তার মুখে বলা আর অন্তরের কথা এক ও অভিন্ন। তার মানসলোক আর চেতনালোক এক ধারায় প্রবাহিত। তিনি যে নতুন সমাজ নির্মাণের কথা বলেছেন, যে রাষ্ট্র নির্মাণের কথা বলেছেন, তা করতে গিয়ে আগে তা ভাঙতে হবে, তাই কবি বলেন,

'আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।' (বিদ্রোহী)

আর এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণি সুদখোর মহাজন শ্রেণি ধর্ম ব্যবসায়ীগণের তাকে এত ভয়, তাকে জেলে বন্দী করে তাকে হত্যা করতে চায়। কারণ শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি যারা তারা যে দুর্বিনীত ও প্রবল প্রাণশক্তিতে বলীয়ান দেবত্বের অধিকারী তাদের দমানো যায় না, তারা অদম্য সাহসী। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদের এক চরম উল্লাস ঘটতে দেখা যায়। যে ব্যক্তিত্ববাদ আমিত্ববাদের মাঝ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একজন ব্যক্তি যখন সমষ্টিগত গণমানুষের চেতনার চরম উৎস হয়ে যান, তখন তিনি আর শুধু একজন মানুষ থাকেন না; তিনি হয়ে উঠে সকল মানুষের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি। ধর্মীয়, রূপকে যাকে বলা যায় খলিফা আর সমাজ বিপ্লবের দৃষ্টিতে যাকে বলা যায় বিপ্লবী পথিক থেকে মহানায়ক। সেই অর্থে রাষ্ট্র বিপ্লবের নায়ক হিসেবে আমরা (রুশ বিপ্লব ১৯১৭) মহামতি লেলিনের নাম, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গণ চীনের মহানায়ক কমরেড মাও সেতুং-এর নাম নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি। তবে তাদের মধ্যে নজরুলের এক বাস্তবগত পার্থক্য রয়েছে সেটি হলো নজরুল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তারা স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। নজরুল স্বপ্নচারী যা সমাজ বিপ্লবের, সমাজ পরিবর্তনের সমতা ভিত্তিক সমাজ কাঠামো। আর সেটি করতে না পেরে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষেপে যান যা বিদ্রোহী কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
কবি বলেন,

'আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক, হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।'
(বিদ্রোহী)

আমাদের সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মের ভণ্ডামী সুদখোর মহাজনদের নিপীড়ন তাকে মর্মাহত করেছে।

তাই তার হুঙ্কারে শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রের জুলুমবাজ শাসকই নয়; খোদ হাবিয়া দোযখ কেঁপে কেঁপে নিভে যায়। যদিও এটি তার রূপক কবি কল্পনার তাতে সন্দেহ নেই। তবে কাব্য ক্ষেত্রে গূঢ় জীবনবাদী রাষ্ট্র চেতনা আধুনিক বাংলা কবিতায় ইতোপূর্বে দেখা যায়নি। কবিতায় এক দিকে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি চেতনার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে।

'আমি যুবরাজ, মমরাজ বেশে ম্লান গৈরিক। আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'
(বিদ্রোহী)

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মিয়ে থাকে; কিন্তু দেখা যায় কালক্রমে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কাঠামো তাকে নানা রীতি প্রথা আচার অনুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের নামে তাকে শৃঙ্খলিত করে থাকে। এক কথায় মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্ম লাভ করে আর একটু একটু করে তাকে নানাভাবে শৃঙ্খলিত করা হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী সমাজে তিনি জন্মেছেন, তিনি তার স্বাধীন সত্তাকে প্রকাশ করতে পারছেন না।

তার রাজ্য বেশ ম্লান হয়ে আজ ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে; যা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তাই তিনি আরবের সেই মহা বলশালী বেদুঈন স্বাধীন জাতির মত বিশ্ববীর চেঙ্গিস খানের মত নাঙ্গা তলোয়ার হাতে সকল শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কারও কাছে মাথা নত করবেন না স্পষ্ট ভাষায়।
তিনি বলেছেন,

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'
(বিদ্রোহী)

বিদ্রোহী কবিতার এই একটি লাইনেই নজরুল তার ব্যক্তিত্ববাদের চরম উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার প্রবন্ধ সাহিত্যের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। একটি আমার পথ অপরটি ধূমকেতুর পথ। আমার পথ প্রবন্ধে নজরুল বলেন 'ব্যক্তি মানুষের বিবেকের উপর যার মনে বিবেক আছে, তার সত্য আছে, আর তার মিথ্যাকে ভয় পাবার দরকার হবে না। নিজেকে চিনলে; নিজের সত্যকেই সে নিজের কর্ণধার বানালে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে। আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আসবে সেই দিনই আমরা স্বাধীন হবো, তার আগে কিছুতেই নয়।' ইংরেজ লেখক ফ্রান্সি, বেকন (১৯৯৭) বলেন হোয়াট ইজ ট্রুথ, সত্য কি? তা নজরুল প্রবন্ধাবলীতে যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন তেমনি কবিতার পংক্তিমালায়ও যার প্রকাশ রয়েছে। নিজেকে চেনার নিজেকে জানার পর যে বোধোদয় আসে, সে আত্মোপলব্ধি অনুভূত হয়, তখন মানুষ হয় নিশ্চুপ হয়ে যায়, না হয় উন্মাদের মত ছুটে চলে, ইসলামে একে বলে, যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার রবকে চিনতে পেরেছে। আর বৌদ্ধ ধর্মে যাকে বলে বোধসত্তা লাভ বা বুদ্ধত্ব লাভ। সুফীবাদে যাকে বলে আত্মদর্শনে আল্লাহ দর্শন। আর যারা নিজেকে সংবরণ করতে পারে না, তারা উন্মাদের মত করতে থাকে। কারণ তারা সত্য কি দেখতে পেয়েছে, অনুভব করতে পেরেছে। কি করে তা সাধারণ মানুষকে বোঝাবে। আর বোঝালেই কি সকল জ্ঞান সবাই উপলব্ধি করতে পারে না। আর এখানেই জগত সংসারে যত বিপত্তি। যেমন নজরুল তার কবিতায় বলেছেন,

'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ। আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।'
(বিদ্রোহী।)

অত্র কবিতায় কবি আরো বলেছেন:

'আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লম্ফ
আমি ত্রাস সঞ্চারী ভুবনে, সহসা সঞ্চারী ভূমিকম্প।'
(বিদ্রোহী)

একই কবিতার চারটি চরণে সত্য দর্শনে তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস তাকে মহা শক্তিশালী মানস দৃষ্টির অধিকারী করেছে ফলে তিনি নিজের মধ্যে এক ইহজাগতিক অলৌকিক শক্তি অনুভব করেছেন, ফলে তিনি পুলক উল্লাস ব্যক্ত করেছেন। এটি তখনই ঘটে যখন সৃষ্টির অপার রহস্য, সৃষ্টির অপার বিস্ময় মানুষ অবলোকন করতে পারে। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষই শুধু ব্যক্তিত্ববাদের আস্থা রাখতে পারে আর চরম উল্লাসে উল্লাসিত হতে পারেন। বিশ্বের আত্মবিশ্বাসী ২/৩ জন কবি প্রতিভার মাঝে নজরুল অন্যতম।

যে মানুষের ব্যক্তিত্ব নেই, সে কি নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারেন। মোটেই না, মানুষকে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে তার কর্মের মাঝেই। আর সে কর্ম যদি কোন সৃষ্টিশীল কর্ম হয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নাই।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদের চরম উল্লাস যেমনভাবে ঘটেছে তা শুধু বাংলা সাহিত্য কেন সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে আছে কিনা আমার জানা নাই। যদিও নজরুলের বিদ্রোহী কাব্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কমতি নেই। আমি সেদিকে যাবো না। নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদ তার অসংখ্য কবিতায় রয়েছে একদিকে ভারতের হিন্দু সমাজ অপরদিকে মুসলিম সমাজ তিনি দৃষ্টের কূপমণ্ডূকতাকে তুলে ধরেছেন নির্ভীকচিত্তে। কোন ভয় ভীতি লোভ মোহ তাকে আটকে রাখতে বা তাড়িত করতে পারেনি। এটা তার কত বড় সাহস ও ব্যক্তিত্ববাদের প্রকাশ তা বলার অবকাশ রাখে না। তবুও বলতে হবে কবি বলেছেন,

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী পাষাণ চাঁড়াল।'
(আনন্দময়ীর আগমনে)

কবিতাটিতে হিন্দু ধর্মের দেবী দুর্গারে খোঁচা মেরে তার সাথে সমগ্র ভারতবাসীকে মাতৃসম তুলনা করে দেশপ্রেমে জাগ্রত করার মানস বাসনা কাজ করেছে, কারণ পরাধীন ভারতে এটিই প্রধান কাজ। অপরদিকে ভারতের অনগ্রসর পশ্চাৎপদ কুসংস্কারই ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আশ্বস্ত করে জাগাতে চেয়েছেন তিনি। যার ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। কবি বলেছেন:

দাড়ি নাড়ে ফতোয়া ঝাড়ে মসজিদে যায় নামাজ পড়ে, নাইকো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ সব বন্দী-গড়ে 'লানত' গলায় গোলাম ওরা, সালাম করে জুলুম বাজে ধর্ম ধ্বজা উড়ায় দাড়ি গলিজ মুখে কোরান ভাঁজে।' আবার তিনি বলছেন অহিংস আন্দোলন নিয়ে।

'মাদীগুলোর আদি দোষ এ অহিংসা বোল নাকি-নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।'

গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন ছিল নজরুলের ভাষায় দেশপ্রেমের নামে এক চরম ফাঁকি।

কারণ সহিংস ও সমাজ সংগ্রামের পথ ছাড়ায়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতা আসবে না তা তিনি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তার অসংখ্য কবিতা গানে বিপ্লবীদের প্রশংসা কীর্তন করেছেন, তাদের নিয়ে পত্রিকা ধূমকেতুতে আমি সৈনিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিপ্লবীদের নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন তাদের ছবি বিপ্লবী। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, বাঘাযতিন, কানাই লাল, আমার লক্ষ্মী ছাড়ার দল সম্পাদকীয় লিখে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এ সকল চরমপন্থী দেশপ্রেমিক স্বদেশী বিপ্লবীদের ফাঁদে তার সংস্পর্শ বা সহযোগী তাকে যে শুধু নানামুখী বিপদ আপদে ফেলেননি তাই নয় তাকে মুক্তিযুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। তিনি হয়েছেন রাজ বিদ্রোহী রাজবন্দী। শুধু মাত্র কবিতা লেখা বা প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনার জন্যই নয়। সরাসরি বিপ্লবী রাজনীতির মাঠে তার সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণেই তাকে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই তার ব্যক্তিত্ববাদ শুধুমাত্র মানবিক ব্যক্তিত্ববাদ নয় তা এক আদর্শগত ব্যক্তিত্ববাদ। বিদ্রোহী কবিতার ছত্রে ছত্রে তার ব্যক্তিত্ববাদ ছড়িয়ে রয়েছে।

আমি কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী

এখানে কবির প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ধিকরে ধিকরে বেরুচ্ছে, কি যেন আগুন গোলা ফেটে ফুলকি যেভাবে বেরুতে থাকে ঠিক তেমনি শব্দের যে প্রচণ্ড গতি তা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। শব্দের ধ্বনি মালা অনেকক্ষণ যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা কানে বাজতে থাকে।

তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসই তাকে এমন শব্দ চয়নে উৎসাহী করেছে, ফলে কবির মানসও শব্দ ব্যবহার এক কথায় যথাযথ প্রয়োগ সাধিত হয়েছে।

বিদ্রোহী কবিতায়, কবির আত্মবিশ্বাস এক উচ্চমার্গীয় চূড়ায় আরোহণ করেছে। যা সাধারণ পাঠকমাত্র শ্রোতামাত্র অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন না। ফলে সমকালে বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে অহেতুক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। কারণ প্রবাদে আছে সকল খাবার সবার পেটেই যেমন হজম হবে না তেমনি সবাই সব কিছু বুঝতে পারবেন তেমনও নয়। ফলে ভারতবর্ষে বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে নানা বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় মহাভারতের সাথে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত সাধক ভৃগু তার সাধনা করতে থাকেন তাকে ডাকতে ডাকতে ভগবান বিষ্ণু কোন সাড়া দেন না, ফলে সাধক উক্ত ভক্ত অবশেষে নিজের আরাধ্য উপাসক ভগবান বিষ্ণুর বুকে লাথি মেরে তাকে জাগাতে চেয়েছেন। যে কথাটি কবি নজরুল বললেন এভাবে:

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।'
(বিদ্রোহী)

কবির আত্মবিশ্বাসের আরো কয়েকটি উপমা দেয়া যেতে পারে।

'আমি ছিন্ন মস্তা চণ্ডী আমি রণদা সর্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' (বিদ্রোহী)

দেবতাদের সাথে অসুর বাহিনীর যুদ্ধ দেবী চণ্ডি বা কালি মাতা উন্মুক্ত খড়গ হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। কোনো বাঁধাই তাকে আটকাতে পারছে না।

নরমুণ্ডের মালা গলে সদর্পে এগিয়ে চলেছেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, অসমসাহসী দেবীচণ্ডি। কবি নিজের মধ্যে সে অসীম সাহস ও তেজোদীপ্ত মানস অনুভব করছেন। যা তাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছে। তিনি এক পর্যায়ে সকল পাপ-অন্যায়ের প্রতিবাদী মহাশক্তিধর সাধক পুরুষগণ যেমন স্বর্গবাসী হয়ে হাসিমুখে থাকবেন। জাহান্নামের আগুন যাদের স্পর্শ করতে পারবে না, তিনি তাদের গোত্রের বলে নিজেকে বিবেচনা করছেন এবং সেখানেও তিনি পুষ্প হাসিতে অম্লান জীবন যাপন করবেন বলে তার বিশ্বাস।

নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদ তার ধূমকেতু পত্রিকায় সর্বভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে চরমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেন ধূমকেতু সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা এ কথাটার মানে একেকজন মহারথী একেক রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে; সকল কিছু নিয়ম কানুন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

তিনি আরো বলেন বিদ্রোহ মানে কাউকে নামানো নয়; বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটা মাথা উচু করে বলা বুঝি না। আমার বিশ্বাস আত্মার তৃপ্তিই স্বর্গসুখ, আর আত্মপ্রবঞ্চনাই নরক যন্ত্রণা। ধূমকেতুর মত হলো তোমার মন চায়, তাই করো ধর্ম সমাজ রাজ্য দেবতা কাউকেই তোমার মানার দরকার নেই। শুধু নিজের মনের শাসন মেনে চলো। (ধূমকেতুর পথ)

সমকালে নজরুলের ধূমকেতুর ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তার মানস গঠিত হলেও তার নিজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই তার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুলের সমকালে যে পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও ধর্মীয় উন্মাদনা আজো বিভিন্ন রূপকে বিভিন্নভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। অথচ নজরুল ছিলেন এক মহান অসাম্প্রদায়িক কবি প্রতিভা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নিপীড়ন না থাকলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য শোষণ সমাজে আজো বহাল তবিয়তে বর্তমান আছে। কাজেই নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে কবি শাশ্বত মানবাত্মার যে জয় ঘোষণা করেছেন, তার উল্লাস কবিতার পরতে পরতে উচ্চারিত হয়েছে। কবিতার শেষ দুটি চরণ দিয়ে লেখা শেষ করবো

'আমি চির বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা, চিরউন্নত শির।' (বিদ্রোহী)

পরিশেষে বলা যায় যে নজরুল কাব্য বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্যে বটেই; বিশ্ব সাহিত্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হতে দেখা যায় কবিতাটিতে। সেই সাথে চিরন্তন মানবাত্মার মুক্তির বিজয় ঘোষিত হয়েছে। আরো ঘোষিত হয়েছে নজরুলের ব্যক্তিত্ববাদের এক চরম উল্লাস বিদ্রোহী কবিতায়।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: ওমর খৈয়ামের প্রভাব

কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী মৌলিক কবি প্রতিভার নাম। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম প্রতিবাদী চেতনার সার্থক নির্মাতা। অগ্নিবীণা কাব্যে তার প্রতিবাদের সেই অগ্নিগর্ভ লাভা নির্গত হয়েছে অবিরল ধারায়।

ফলে অগ্নিবীণা (১৯২২) কাব্যগ্রন্থটি ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পতিত হয়। অগ্নিবীণা কাব্যের প্রতিটি কবিতায় দেশাত্ববোধ, রাজনৈতিক চেতনা ও বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত তেমনি তাতে যুদ্ধ ও প্রেমের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, যা বলার অবকাশ রাখে না। অগ্নিবীণার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আলোচিত কবিতা হলো বিদ্রোহী। বিদ্রোহী কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। একটি কবিতা একজন কবিকে জগৎজোড়া খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। আমি আমার নিবন্ধে সেদিকে যাবো না। নানা দিকের মাঝে বিদ্রোহী কবিতায় কীভাবে পারস্যের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক মহাকবি ওমর খৈয়ামের প্রভাব রয়েছে তা নিয়ে আলোকপাত করবো।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম পারিবারিকভাবেই মুসলিম হওয়ায় আরবি ফার্সি কিছুটা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৯) পর্যন্ত অংশগ্রহণ। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অংশগ্রহণ ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ। ফার্সি শিখতে গিয়ে তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি ও মহান দার্শনিক ওমর খৈয়ামের সাথে পরিচিত হন। এক পর্যায়ে নজরুল ওমর খৈয়ামের কবিতার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেমন তা পাঠ করেন, তেমনি খৈয়ামের কবিতা পরবর্তী জীবনে অনুবাদ করেন। তার সেই অনুবাদ কর্মই রুবাইত-ই ওমর খৈয়াম প্রকাশিত হয়েছে। তবে মহাকবি ওমর খৈয়ামের প্রভাব স্পষ্টতর হয়েছে তার বিদ্রোহী কবিতাসহ ব্যক্তি জীবনাদর্শে। মহা কবি ওমর খৈয়াম হাজার বছর পূর্বেও এতটাই আধুনিক ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন যে, আজও তাঁর কবিতায় ও বিজ্ঞানের অবদান সমান আধুনিক ও জনপ্রিয় হয়ে আছেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিদ্যায় গবেষণা শুরু করেছিলেন এই মহান বিজ্ঞান দার্শনিক। ওমর খৈয়াম অনুধাবন করেন প্রচলিত গ্রীক পদ্ধতিতে নিখাদ মমী করণের সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি নতুন পদ্ধতির কথা চিন্তা করেন ও সফলতা অর্জন করেন। মাত্র আশি বছর বয়সেই তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিদ্যার অসামান্য সাফল্য অর্জন করে বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে মাকালাত ফি আল জাবর আল মুকাবিলা গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি জ্যোতির্বিদ হিসেবে সুপরিচিত হন। তিনি ফার্সি তথা বিশ্ব সাহিত্যের এক মহান কবি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের পাশাপাশি তিনি লিখে গেছেন প্রেম প্রকৃতি ও দার্শনিকতায় ভরা অমর সব মহাকাব্য। তিনি বিশ্ব সাহিত্যের এক বিস্ময় সৃষ্টিকারী মহান কবি। মুসলিম ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে তার অবদান অবিস্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের

গবেষণা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে তার একাগ্রতা প্রমাণিত ও স্বীকৃত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার চিন্তা ও দর্শন সভ্যতার বিকাশকে করেছে গতিশীল ও সমৃদ্ধ। রসায়ন, পদার্থ, জীব বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞানে, দর্শন ও ইতিহাসে তার অগ্রণী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয় তিনি ইউক্লিডিয় জ্যামিতি নিয়েও কাজ করেছেন। মুসলিম আরেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইরান মিনার চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন ও গণিত নিয়ে ছাত্রদের পাঠদান করেছে। এমন কি তার প্রতিভার দিগন্ত এতটাই বিস্তৃত ছিলো যে কবিতার পাশাপাশি সঙ্গীত শাস্ত্র আইন শাস্ত্রও বাদ যায়নি। সত্যি মহাকবি ওমর খৈয়াম অতুলনীয়, অসাধারণ, অনুপম এক আদর্শ। তার মহাকাব্য রুবাইৎ-ই ওমর খৈয়ামের অনুবাদ কাজ করেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। যার ভূমিকা লিখেছেন রম্য লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। জীবনবাদী এই মহান লেখক কবি নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলো। নজরুলের অনুবাদ প্রাণবন্ত, হৃদয়স্পর্শী, মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ ছিলো বলেই অনুভূতির স্পর্শে স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত। ওমর খৈয়ামের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের অবদানের সম্পর্কে ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যাবে না। মন্তব্য করতে পারস্যের আরেক বিখ্যাত গবেষক আল কাতান জানি বলেছেন, ওমর খৈয়ামের মত এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক শুধু পারস্যে নয়; সারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

তিনি বিশ্বের বিস্ময়। কালের নিরিখে সেকালের বিজ্ঞান গবেষণার মূল্যায়ন ছিলো না। তা না হলে ওমর খৈয়ামের মানমন্দিরে থেকে প্রথম প্রমাণ করেছেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে ভ্রমণ নিখুঁত হিসাব পৃথিবীতে আর কোনো বিজ্ঞানী দিতে পারেননি। তিনি চতুর্দশপদী কবিতাও লিখেছেন এমন কবিতাকে রুবাইত নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার মৃত্যুর ৭৩৪ বছর পরে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, ওমর খৈয়ামের কবিতাগুলো প্রেম-প্রকৃতি রসে ভরপুর। শুধু তাই নয় আধ্যাত্মিক প্রেম রসেও উজ্জীবিত। ফলে ওমর খৈয়াম পৃথিবীর সেরা কবিদের অন্যতম সেরা বলে আজ প্রতিষ্ঠিত।

ফারসি ভাষায় রচিত কাব্য সাহিত্যকে মূলত চারভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. মহাকাব্য বা কাসিদা
২. গজল বা গীতি কবিতা
৩. মসনবী বা দীর্ঘ কাব্যগাঁথা
৪. রুবাইৎ বা এক বচনের কাব্য

প্রতিটি রুবাইতে থাকে একটি মাত্র ভাব, যাকে অবলম্বন করে প্রকাশ করা হয় প্রেম, দ্রোহ, যা আনন্দ বিষাদ। মার্কিন কবি জেমস রাসেল লোয়েল ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ চতুর্দশপদী কবিতাগুলোকে চিন্তা উদ্দীপক পারস্য উপসাগরের মনি মুক্তা বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফিটজেরাল্ড ওমরের কবিতা অনুবাদ করেন এবং দশ বছরের বেশি সময় তা সংস্করণের পর প্রকাশিত হয়। ফলে মহাকবি ওমর খৈয়াম যেমন আলোচিত সমালোচিত হন তেমনি সেগুলো নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ নিবন্ধ বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে নানা গ্রন্থে। ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি ওমর খৈয়ামকে বিশ্বজনীন চিন্তা দৃষ্টির পথিকৃৎ অনেক কবি সাহিত্যিক মনের অজানা কথা তিনি হাজার বছর পূর্বেই বলে গেছেন। আবার ওমর খৈয়ামের কবিতার মাঝে অনেকে নিজের অনুসন্ধিৎসু মনের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। ১১৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর বিশ্ব বরেণ্য, এই মহান কবি পারস্যের নিশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পারস্যের জগতখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি কতটা গভীরভাবে ওমর খৈয়ামকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা জানা যায় নজরুলকৃত রুবাইয়ৎ-এর ওমর খৈয়ামের অনুবাদের ভূমিকা পাঠে। যেহেতু নজরুল ফার্সি ভাষার সাথে আগেই পরিচিত ছিলেন। তার চাচা কাজী বজলে করিম ছিলেন ফার্সি ভাষার পণ্ডিত। তাছাড়া শিয়ারশোল রাজ স্কুলে নজরুলের দ্বিতীয় ভাষা ছিলো ফার্সি তৃতীয় নজরুল বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগ দিলে সেখানে এক পাঞ্জাবি সৈনিক ছিলেন ফার্সি মৌলবী। তিনি তার কাছেও ফার্সি ভাষা শিখে খৈয়ামের কাব্য আয়ত্ব করেন। ফলে বাংলা রূপে অনুবাদ করতে তার কোন অসুবিধাই হয়নি। ওমর খৈয়ামের রুবাইৎগুলো সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন 'ওমরের কাব্যে শরাব-সাকীর ছড়াছড়ি থাকলেও; তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তার কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা অথচ সংযমের আটসাট গাঁথুনী, তার জীবনও ছিলো তেমন। তিনি মদ্যপ লম্পটের জীবন যাপন করতে পারেননি। তাছাড়া অভাবে জীবন যাপন করলে শেষবারে তা লিখে রাখতে ভুলে যেতেন না। অথচ তার সবচেয়ে বড় শক্তিও তা লিখে যাননি। এই মহান কবি তার ছাত্রদের বিশেষ উপদেশ দানের জন্য আহ্বান করেন। তিনি জীবনে শেষ বারের মত ওজু করে এশার নামাজ আদায় করেন এবং পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে সেজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে ওমর খৈয়ামের প্রভাব: ওমর খৈয়াম বিশ্ব সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নজরুল ইসলাম বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান অনুরাগ বিশেষ করে মহা কবি ওমর খৈয়ামের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৯) তিনি সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে পাঞ্জাবি সৈনিকের কাছে ফার্সি ভাষা শিখে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কবিতা সম্পর্কে নজরুল ইসলাম বুৎপত্তি অর্জন করেন। এক পর্যায়ে নজরুল মহাকবি ওমর খৈয়ামের কবিতা ও ধর্মীয় দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল নিজেই বলেছেন, 'আমাদের বাঙালি প্লাটুনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন একদিন তিনি দিওয়ানী হাফিজ থেকে কতকগুলো কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেদিন থেকে তাঁর কাছে ফারসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তারই কাছে এসে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।'

বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, রুমী, জামী ও ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবি নজরুলের প্রতি প্রভাব ফেলেছিলেন। তবে এদের মধ্যে পারস্যের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন নজরুলের জীবন ও মানসলোকে। ওমর খৈয়ামের কবিতা ও দর্শন এতটাই আকর্ষণ করেছিলো যে নজরুল প্রচলিত ধর্মবোধকে, তার আনুষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করতে শুরু করেন। ওমর খৈয়ামের ফুকরিয়া মতবাদের কবিতা ও ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ নজরুলকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে। সমাজে ধর্মের নামে ভণ্ডামী, ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাই অতিষ্ট হয়ে জোর প্রতিবাদী হয়ে তার শিকল ছিন্ন করতে চাইলেন। যা বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রকাশিত হলো তার বিদ্রোহী কবিতাতে। কীসের আবার ধর্মশাস্ত্র মানুষই সব, মানুষই শ্রেষ্ঠ।

‘ভূলোক দ্যুলোক গোলাক ভেদিয়া
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।’
(বিদ্রোহী)

অথবা
‘আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।’ (বিদ্রোহী)

আর এ কারণেই ওমর খৈয়ামের দর্শন নজরুলকে মুগ্ধ করেছে, আপ্লুত করেছে, পরিপূর্ণ করেছে। আসলে একটি প্রশ্ন সামনে এসে যায়, ওমরের দর্শন কী? ওমরের দর্শন হলো– ‘সব মিথ্যা, অর্থাৎ পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপপুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা। একমাত্র সত্য যে মুহূর্তে হাতের মুঠোয় এলো তাঁকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও তিনি আমাদের সুখে দুঃখে নির্বিকার, আমরা তার হাতের খেলার পুতুল মাত্র।

তিনি সৃষ্টি করছেন, ভাঙছেন তার খেয়াল মত, তুমি কাঁদলেও যা হবে, না কাঁদলেও তাই হবে, যা হবার তাতো হবেই। যে মরে গেলো সে একেবারেই গেলো, সে আর কখনো আসবেও না বাঁচবেও না। তাঁর পাপ-পুণ্য স্রষ্টারই আদেশে, তার খেলা জমাবার জন্য। মোট কথা, স্রষ্টা একটা বিরাট খেয়ালী শিশু বা ঐন্দ্রজালিক। নজরুলের একটি গানে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।

‘খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা
নিরজনে প্রভু নিরজনে।’

এ সম্পর্কে নজরুলের অভিমত হলো,

‘আমাদের অবিশ্বাসী মন জিজ্ঞাসা
করে উঠে, কেন এই জীবন, কেন এই মৃত্যু।
স্বর্গ নরক ভগবান বলে সত্যই কি কিছু আছে?
আমরা মরে কোথায় যাই?’

কেন এই হানাহানি, এই অভাব দুঃখ শোক? এমনিতর অগণিত প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে সে তার উত্তরের প্রকাশে কিছুই দেখাতে পারেনি, শুধু বলেছে বিশ্বাস করো। তবুও আবেদের মন বিশ্বাস করতে চায় না। সে তর্ক করতে শিখেছে। এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবতার পয়গম্বর এলেন, তবুও যে প্রশ্ন সে প্রশ্নই রয়ে গেলো। মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না। নজরুল মূলত এভাবেই মহাকবি ওমর খৈয়ামের দর্শন জগতে প্রবেশ করেছেন। তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি স্বমহিমায় ও মৌলিকত্বে ভাস্বর হয়ে আছেন।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: আধ্যাত্মিক দর্শন

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮১১-১৯৭৬) এর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব এক বৈপ্লবিক ঘটনার সূচনা করেছে। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক অনুবাদ, শিশু সাহিত্য, চলচ্চিত্র কাহিনি পত্রিকা সম্পাদনাসহ বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিতা- গানে তিনি নতুন ভাব ভাষা ছন্দে রূপক প্রতীকের ব্যবহারে এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা এনেছেন। বলা হয়ে থাকে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। আধুনিক বাংলা কবিতায় ব্যাপক আরবি ফারসি শব্দের সফল ব্যবহার করে নজরুল যে স্বকীয়তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ও নিজস্ব সত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। ব্যাপক আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার করে তিনি যে সকল কবিতার সফলতার পরিচয় দিয়েছেন সে কবিতাগুলোর মধ্যে মহররম (১৩২৭ আশ্বিন মুসলেম ভারত) কোরবানী (১৩২৭ মুসলেম ভারত), শাতিল আরব (১৩২৭ বাংলা) মুসলেম ভারত, খেয়া পাড়ের তরণী (১৩২৭ মুসলেম ভারত) খালেদ উমর ফারুক– ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম। কামাল পাশা (অক্টোবর - ১৯২১-১৩২৮ আশ্বিন সন্ধ্যায় মুসলেম ভারত), আনোয়ার পাশা (কার্তিক-১৩২৮ বাংলা সাধক সংখ্যায় অগ্নিবীণা)। রীফ সর্দ্দার, ধূমকেতু। হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী মহাকাব্য, মরু ভাস্কর (১৯৫১) উল্লিখিত কবিতাগুলোতে নজরুল ব্যাপকভাবে আলোচিত হন ও বাংলার কবি সাহিত্যিক ও গণমানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন। এক সময়ে হিন্দু কবি ও গদ্যকারগণ বলতেন মুসলমানগণ ভাল করে বাংলা লিখতে ও পড়তে পারে না; কিন্তু তাদেরকে ধারণা ভেঙ্গে দিলেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক মীর মোশাররফ হোসেন, আর কবিতা গানে কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল তার বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী (১৯২২) রচনার পূর্বেই ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৪ ডিসেম্বর মতান্তরে ২৫ ডিসেম্বর কবি তার অমর কবিতা বিদ্রোহী রচনা করেন। যে কবিতা নজরুলকে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়; বিশ্ব সাহিত্যে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন সকল কালের, সকল যুগের, সকল মানুষের আশা জাগরণ ও চৈতন্যের কবি। শুধু প্রেম ও রোমান্টিকতায় যিনি আত্মনিমগ্ন নন। মানুষের সকল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যার সাহিত্য কবিতা গানের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। মানুষের মুক্তি ও উত্থান অধিকার কামনাই যার সাহিত্যের চিরন্তন উৎস ভূমি। যে কারণে তিনি সকল মেকি, জড়তা, ভীরুতা, কুসংস্কার, ভণ্ডামী ও শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার এ বিদ্রোহ সর্বকালীন ও সার্বজনীন আদর্শে উচ্চকিত উদ্ভাসিত। যে বিদ্রোহ যুগ থেকে যুগে কাল থেকে কালান্তরে প্রবহমান। যার শুধু সামাজিক রূপ বদলায় মাত্র; কিন্তু তাঁর শোষণের যেমন রূপের বদল হয় মাত্র, তেমনি শোষণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ও বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ ঘটছে। নজরুল কাব্য বিদ্রোহী, সেই নিপীড়িত শাশ্বত মানবতার চিরন্তন মুক্তির এক জয় নিশান। কবিতাটির মধ্যে একদিকে সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক শৃঙ্খল মুক্তি, অর্থনৈতিক সমতা, সাংস্কৃতিক আবহের কথা রয়েছে, তেমনি বিদ্রোহীতে রয়েছে ধর্মীয় আবহ, ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বর্ণনা, ধর্মের নিগূঢ় রূপ অরূপের ছায়াপাত ঘটেছে। হিন্দু ধর্মের মীথ, আবার ইসলাম ধর্মের ব্যাপক মুসলিম মীথের ব্যবহার করা হয়েছে কবিতাটিতে। কবিতাটিতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়নের কথার পাশাপাশি, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। যে সুর ভারতের দুইটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। একদিকে মহাভারতের কাহিনীর বিভিন্ন দেব-দেবীর ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা; নানা রূপক প্রতীকের উপমার ব্যবহার করেছেন। অপর দিকে ইসলামের নবী রাসুল (সা.) বেহেশত, দোযখ ও ফেরেশতাগণের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারে অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেছেন কবি।

বিদ্রোহী কবিতার আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ :

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী রাজনৈতিক সামাজিক সামন্তবাদ পুঁজিবাদ ও ধর্মের নামে ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে শুধু একটি বিক্ষোভ বিপ্লবের এক জ্বলন্ত মশালই নয় বিদ্রোহী কবিতায় রয়েছে এক বিদ্রোহাত্মক গভীর অধ্যাত্মবোধ বা অধ্যাত্মিক চেতনা। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাদর্শ সম্পর্কে নজরুল ছিলেন সম্যক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন জ্ঞানের অধিকারী। তাই তাঁর কবিতায় এক গভীর অধ্যাত্মবোধ ফুটে উঠেছে।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা। কবি বিদ্রোহী কবিতা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের সম্ভবত ২৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে রচনা করেছেন। ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যায় বিদ্রোহী সাপ্তাহিক মুসলেম ভারতে প্রথম ছাপা হয়। অন্যমতে ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলীতে প্রথম ছাপা হয়েছে বলে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। কবিতাটি তিন সপ্তাহ পর প্রবাসীসহ ভারতবর্ষের প্রায় ডজন খানেক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আবার জনপ্রিয়তার কারণে একাধিকবারও ছাপা হয়েছে। কবিতাটিতে একদিকে আত্মজাগরণের সাথে জাতীয় জাগরণের যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তা বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে সামাজিক রাজনৈতিক শৃঙ্খল মুক্তির পাশাপাশি আত্মমুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বের মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের শির (মস্তক) যে পরম করুণাময় সৃষ্টি করেছেন, শুধু তার কাছেই সিজদাবনত হবে। কোন প্রাণী বস্তু কোন মানুষ শাসক গোষ্ঠীর কাছে নয়। কোন সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বা কোন ইজমের বেড়াজালে আবদ্ধ যে শির চিরন্তন মুক্ত তা নত হতে পারে না; কারণ তা হিমালয় চূড়ার ন্যায় উন্নত থাকবে।

কবি বলেছেন:

> বল বীর! বল চির উন্নত মম শির
> শির নেহারি আমারি
> নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির। (বিদ্রোহী)

ইসলামও সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। ইসলাম একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন জড় পদার্থ, অত্যাচারী জালিমশাহীর তখত-তাউসের সামনে কোন ঈমানদারের নত মস্তককে সমর্থন করে না। ভারতে মোগল শাসনামলে মহামতি সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবরের সময় হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) কে একদিন দিল্লির খাস শাহী মহলে সম্রাট আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শাহী মহলে লোহার গেটটি নিচু করে বানানো। হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) সম্রাটের চালাকি বুঝতে পেরে নিজের মস্তক উন্নত রেখেই সম্রাটের সামনে দিয়ে মহলে প্রবেশ করেন। তবুও আল্লাহর ওলি নিজাম উদ্দিন (র.) স্বীয় মস্তক সম্রাটের সামনে নত করেননি। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় মূলত অধ্যাত্মবাদের চরম প্রকাশ বা ফানাফিল্লাহর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটিতে ১৪০ বার আমিত্বের ব্যবহার করা হয়েছে। এই আমিত্বের মাঝেই অধ্যাত্মবাদের চরম প্রকাশ ঘটে থাকে। কবি বলেন: 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মমললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে/ রাজ রাজটিকা/ দীপ্ত জয়শ্রীর।' (বিদ্রোহী)
আপাতদৃষ্টিতে নজরুলের এ সকল বাক্যাংশ অসংলগ্ন শরিয়ত বিরোধী ইসলাম বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই নজরুল অধ্যাত্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ও সাধনা করেছেন যা আমরা জানিনা। বিশেষত তিনি পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের দর্শন নিয়েও ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন। ফলে ওমর খৈয়ামের দর্শন নজরুলে পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) পরম করুণাময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে রাতের আঁধারে গমন করলে প্রথম আসমান- ২য় আসমানসহ এভাবে সকল আসমান পেরিয়ে তিনি মওলা পাকের আরশে মোয়াল্লায় পৌঁছে যান। এখানে নজরুল সেই হযরত মুহম্মদ (স.) এর মেরাজ গমনের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণ করে নিজের মধ্যে মেরাজের অস্তিত্বকে অনুভব ও আবিষ্কার করেছেন। আর স্পষ্ট ভাষায় সেই স্মৃতিকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন:
১। 'তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা/ বাহন আমার / হিম্মত হেষ্রা হেঁকে চলে।'
২। 'ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া / স্বর্গমর্ত্য করতলে।' (বিদ্রোহী)

ভাববাদের অধ্যাত্ম সাধনায় আল্লাহর গুণিগণ দিব্য দৃষ্টিতে সকল কিছু দেখতে পান স্পষ্টভাবে। আর তখন তারা নিজেকে চিনতে পারেন আর প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলতে থাকেন কবির ভাষায়: 'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি/ একি আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ।'

'আমি সহসা চিনেছি আমারে/ আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধা।' (বিদ্রোহী)
পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেন, 'তোমার রবকে চিনতে হলে আগে নিজেকে চিন।' (আল কুরআন)

যখন একজন মানুষ নিজেকে চিনতে পারে; তখন বুঝতে হবে, তিনি আত্মজ্ঞানী এক মহান সাধক। আর এই মাপের সাধকগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে ফানাফিল্লাহর মার্গে পৌঁছে যা মারেফাতের ভাষায় আত্ম জ্ঞান শূন্য হওয়া। আমিত্বের শক্তি প্রগাঢ় - অনড় অটল। সে শক্তি ও বিশ্বাসকে কেউ সহজে ভাঙতে পারবে না। তাই সাধকগণ স্বীয় বিশ্বাসের জোরে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন। সাধকের সেই বিশ্বাসের জোরে যে কার্য সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে, তাঁকে মারেফাতের ভাষায় কাশ্‌ফ শক্তি বা অলৌকিক শক্তিও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন মহাপুরুষ নবী (আ.) অথবা ওলি আউলিয়াদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। ইসলাম প্রচারক হযরত খাজা মাঈন উদ্দিন (রা.), হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন (র.), হযরত শাহ জালাল (র.), হযরত শাহ পরান (র.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)সহ মহান আউলিয়া কেরামদের জীবনী পাকে সে কথা জানা যায়। মারেফাতের সেই কঠিন পথে চলতে চলতে যারা আগুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়েছেন, যাদের উপরে করুণাময়ের অপার রহমত বর্ষিত হয়েছে, তাদেরই একজন আল্লাহর মহান সাধক হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)। যিনি করুণাময়ের সাধনায় ও ধ্যানে এতটাই মশগুল থেকেছে যে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি এক অপার্থিব জগতে বিচরণ করতেন। তখন তাঁর বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে ফানাফিল্লাহর জগতে প্রবেশ করতেন। এই অবস্থায় উপনীত হলে কোন সাধকের শরীরের অস্তিত্ব লোপ পায়; অতঃপর তাঁর শরীরে আঘাত করলে, কোন অংশ কেটে নিলেও সাধক পুরুষ টের পাবেন না। শুধু তার অন্তর বাহিরে দয়াময় সেই অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেন, তাঁকে দেখতে পান। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম আহার ঘুমসহ সকল কর্ম তিনি ভুলে যান। মারেফাতের সেই স্তরের সাধক হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)। একবার তিনি পরম প্রভুর সাধনায় জিকির আজকারে এমন মশগুল হলেন যে তিনি আল্লাহ হক জিকির করতে করতে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে, তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার ভেতর থেকে জিকির উৎথিত হতে থাকে আয়নাল হক আয়নাল হক বলে। ইহা শুনে তো সমকালীন আলেমান সমাজ ক্ষেপে যান এবং কাজীর দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ দাবী করেছেন। খোদাদ্রোহীতার অপরাধে মনসুর হাল্লাজ (র.) এর ফাঁসির আদেশ হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে মনসুর হাল্লাজ (র.) বলে গিয়েছিলেন আমার মৃত্যুর পরে তোমরা যেখানেই আমার দেহের অস্তিত্ব ফেলোনা কেন সেখান থেকেই আমার প্রভুর অস্তিত্ব আমার ভেতর শুনতে পাবে। অতঃপর এই মহান সাধকের মৃত দেহ থেকেও আনাল হক জিকির উদিত হতে তাকে, পরে দেহ পুড়িয়ে দেয়া হলে ছাই ভস্ম থেকেও জিকির হতে থাকে আনাল হক। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) গায়ের একটি জোব্বা জামা তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার দেহের ছাই ভস্ম যদি সাগরেও নিক্ষেপ করে তবে ও ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস হয়ে সকল কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।' তখন তুমি আমার গায়ের জামাটি সাগরে নিক্ষেপ করবে, তবেই দেখবে সাগর শান্ত হয়ে যাবে। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে অসংখ্যবার আধ্যাত্মিকতার চেতনা স্পর্শ স্বাদ গন্ধ আমরা পাই। যেমন-

"আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ
আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার

অমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার।"

আরবের বেদুঈন জাতি পরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ, তারা এতটাই স্বাধীনচেতা যে কাউকে কুর্ণিশ করার তারা প্রয়োজন মনে করেন না। আর এখানে কুর্ণিশ না করার ক্ষেত্রে রূপক প্রতীক অর্থে মাথা উচু করে বেঁচে থাকা বেদুঈন জাতির উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য দিকে ইসলাম এক আল্লাহ ছাড়া কোন প্রাণী, কোন মানুষ, কোন জড় বস্তুর প্রতি হয়ে প্রণাম-ছালাম বা সেজদা করাকে নিষেধ করেছে। মাথা শুধু নত করে প্রভুর আরাধনায় নামাজ কয়েমের সময় রুকু আর সেজদায়।

ধরি বাসুকির ফণা জাপটি, –

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি (বিদ্রোহী)।

বিদ্রোহী কবিতার পরতে পরতে রয়েছে নজরুলের ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা। বাসুকি হচ্ছেন পদ্মা দেবীর ভাই এবং দেবী পার্বতী ও শিবের পুত্র। তিনি নাগ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সাপের সাথেই পাতালেই তাঁর বাস। যে বিষাক্ত সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, প্রাণীকুল ভয় পায়। যে নাগকুলের বিষে সমুদ্র বিষাক্ত হয়ে যায়। সেই নাগকুলের অন্যতম বাসুকির ফণা জাপটে ধরার কথা বলা হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যত ঐশিবাণী প্রেরিত হয়ে থাকে, সেই বাণী বাহক স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাইল (আ.)। তিনি আগুনের তৈরী পাখায় ভর করে বাতাসে উড়ে উড়ে যেতেন স্বীয় কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে এই মাটির ধরাধামে। কিংবা ভীম দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী বিশ্বাস থেকে কবি স্বর্গীয় দূতের পাখা সাপটে ধরে রাখার ঘোষণা করেছেন। আবার কবি বলছেন: "আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া/ ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া (বিদ্রোহী)।"

আগেই বলেছি প্রবল ধর্মবোধ ও আত্মবিশ্বাসী মনের আধ্যাত্মিকতা বিদ্রোহী কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় আমিত্বের যে ব্যবহার, তা শুধু কবি কল্পনা মাত্র নয়; অথবা প্রতীকের রূপকের প্রয়োগও নয়, 'এ হচ্ছে তার গভীর ধর্মবোধ নিজের মধ্যে ঈশ্বর চেতনার অস্তিত্ব ও বাহ্য জ্ঞানশূন্য সাধকের অভিব্যক্তি ঘটে। যা সাধারণের ধর্মবোধ প্রচলিত আচরণের সাথে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না; এখানেই সৃষ্টিশীল মহৎ কবির আত্মিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ।

'বিশ্বের আমি চির দুর্জয়,
জগদীশ্বর - ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি/স্বর্গ পাতাল মর্ত্য
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ
আমি চিনেছি আমারে, আজকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'
(বিদ্রোহী)।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি, যাকে ইচ্ছা অন্ধকারে ফেলি। নজরুল বিশ্ব সাহিতের এক মহাপথিক, ন্যায় সত্য ও ঈশ্বর ভাবনার অনন্য উদাহরণ; তবে তা গতানুগতিক ভাবনার অনুসারী নয়। তাই আমাদের সাধারণ চিন্তার মত, অতি সাধারণ আচার, আচরণের মত তার আচরণ নয়; তিনি চিন্তা জগতের এক অসাধারণ অনন্য প্রতিভাধর কবি প্রতিভা। আল্লাহর প্রেমে জগৎ সংসারে যারা খ্যাতি লাভ করেছেন, নতুন চিন্তা মুক্ত চিন্তায় যারা জগৎ সংসারকে সৃষ্টি সম্ভার উপহার দিয়েছেন তিনি তাদেরই একজন। খোদার প্রেমে যারা দিবানিশি মশগুল, যারা গভীর সাধনায় রাত্রী কাটিয়ে দেন খোদারে পাওয়ার পথ খুঁজতে, তারা উত্তম পুরুষ। এই জগৎ সংসারে থেকেই তারা আল্লাহকে পাওয়ার প্রয়াস পান, এজন্য তাদের বনে জঙ্গলে যেতে হয় না; শুধু হৃদয়ে করুণাময়ের অস্তিত্ব ধারণ করতে হয় মাত্র। পরম প্রভুর ভালোবাসায় যিনি ধন্য হয়ে যান, তিনি হয়ে উঠেন অজর অমর অক্ষয় - মানব দানব দেবতার ভয় তাঁকে নিয়ে। শুধু তাই নয়, জগৎ সংসার তাঁকে ভয় পায়। আল্লাহর নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) হেরা গুহায় বার বছর অধিককাল গভীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন ও সিদ্ধিলাভ করে ঘরে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি মানব সমাজে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত হন। নিজেকে চিনতে পেরে তিনি তার গুরুদায়িত্ব পালন করেন, বিশ্ববাসীকে সত্য পাঠের পয়গাম পেশ করেন। তিনিই পুরুষোত্তম সত্য। জগদ্বীশ্বর বলতে আমরা যে মহান আল্লাহকে বুঝি আসলে তা নয়; এটি পৃথিবীর শাসক অর্থে বুঝানো হয়েছে। আমিত্বের যে প্রবল প্রতাপ, শাসন শৃঙ্খলার যে বিনাশ সাধন এখানে নৈরাজ্যবাদী একটি পরিবেশের রূপকল্প কল্পনার দৃষ্টিতে পাওয়া যায়। আর সেই পরম আরাধ্য পুরুষের স্বর্গ পাতাল মর্ত্য তাথৈ তাথৈ করে নাচতে পারেন। যখন তিনি নিজেকে চিনতে পারেন। আর নিজেকে চিনতে পারলে তখন সকল অচেনাকে মানুষ চিনতে পারেন। তখন কোন বাঁধন আর থাকে না। সমাজ সংসার মানুষের হাজার মতবাদের বেড়াজাল, মায়ামোহ থেকে মুক্তি মিলবে। এই মুক্তি শুধু বাঁধন শৃঙ্খল থেকে নয় যে মৃত্যুকে ভয় পাই তা থেকেও এই হচ্ছে পুরুষোত্তম সত্যের রূপ কল্পনা। আর তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গ পাতাল মর্ত্য। এখানে মহা ভারতের শিব-পার্বতীর যে বিচ্ছেদ, তাতে মহেশ্বর শিব অতি দুঃখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি স্বর্গ পাতাল মর্ত্য জুড়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করেন। এতে জগত সংসার ও স্বর্গ পাতাল জুড়ে প্রাণীকুল ও পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন হয়ে উঠে। নজরুল সেই চিত্রকল্পের, সেই আবহের অবতারণা করে তার সাথে নিজের একটি আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য বা সাযুজ্য খুঁজে 'মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।' আবার বলেন : 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী (বিদ্রোহী)।' এখানে কবি নিজেকে প্রেমিক পুরুষ কৃষ্ণের সাথে নিজের একটি দৃশ্যময়তার তুলনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে প্রেমিক পুরুষ, অপরদিকে এক অধ্যাত্মবাদের মহান পুরুষ। প্রেমের মাঝেই পৃথিবীর সৃষ্টি, প্রেমের মাঝে জীবন সৃষ্টি। প্রেমের মাঝেই পরম প্রভুর, অদ্বৈতসম্ভার রূপ দর্শন করা যায়, কাজেই প্রেমবাদে পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। একজন বাউল কবি বলেন- প্রেমিক না হইলে ভবে খোদা মিলে না। আবার হাছন রাজা বলেন:

'পিয়ারির প্রেমে হাছন রাজা মজিল রে,
লোকে বলে, বলে রে
ঘর বাড়ি ভালা না আমার।' (হাছন রাজার গান)

বিদ্রোহী কবিতায় কবি আবার সমাজ বিপ্লব, মানব মনের চিরন্তন মুক্তি, মানুষের শোষণ পীড়ন থেকে মুক্তি, মানুষের শাশ্বত অধিকার সর্বোপরি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত স্বরূপ। তার এ মানুষের অধিকার চাওয়ায় কোন দেশ কাল ধর্ম বর্ণ গোত্রের সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি। এক সার্বজনীন আদর্শ চেতনায় তা উদ্ভাসিত। নজরুল রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাওয়ার পাশাপাশি, চিরন্তন মানবাত্মার মুক্তি কামনা করেছেন। এ মুক্তির মাঝেই তার আধ্যাত্মিক চেতনার চরম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই চেতনা ভারতীয় মিথের ক্ষেত্রেও যেমন তেমনি মুসলিম মিথের ব্যবহার রয়েছে। 'আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রনদা সর্বনাশী, আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' এখানে রূপক অর্থে সকল অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের ধ্বংস সাধনে কবি মহা ভারতের দেবী চন্ডির রূপে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেঁয়েছেন; তিনি দেশবাসীর মাঝে চন্ডির অগ্নিমূর্তি কামনা করে জাতির মুক্তির প্রয়াস পেয়েছেন। আবার কবি এতে যদি তার জাহান্নামের মত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ভোগ করতে হয়, জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে তিনি সেখানে বসেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে ফুলের হাসি হাসবেন। মুসলিম ও ভারতীয় মীথের এই অপূর্ব ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। ভগবান তার ভক্তগণের প্রার্থনা শোনে না, নির্বিকার থাকে, উদাসীন থাকে। কবি তার বুকে পদাঘাত করে তার জাগরণ কামনা করেছেন। – কবির ভাষায় 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেব পদচিহ্ন।' (বিদ্রোহী)

এই যে তার বিদ্রোহী, যা চিরন্তন শাশ্বত, মানব আত্মার আবহমান, এ বিদ্রোহ চলবে অবিরাম। পরিশেষে বলতে চাই যে, বিদ্রোহী কবিতা শুধু কবিতা নয়; এ একটি মানব মুক্তির একটি ভাষাগত আগুনের ফুলকি। এ কবিতার ছত্রে ছত্রে আধ্যাত্মিকতার এক গূঢ় তাত্ত্বিক বাণী নিহিত রয়েছে; যা অনুধাবন করাও সহজ বিষয় নয়।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: সকল যুগে প্রাসঙ্গিক

বিশ্বের প্রতি জাতির জাতীয় জীবনে নানা সময় নানা দুর্ভোগ দুর্বিপাক শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার নেমে আসে। কখনো তা সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণির কাছ থেকে আবার তা কখনো পুঁজিবাদী সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে আবার কখনো সামাজিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছ থেকে। আমি যদি প্রমাণ দিতে যাই, শতেক প্রমাণ অবশ্যই হাজির করতে পারবো। আমার এ নিবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনায় গেলে সকল যুগে বিদ্রোহী কাব্যের প্রাসঙ্গিকতার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারবো না। তাই সকল কালে বিদ্রোহীর প্রয়োজনীয়তা নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহী কাব্যটি কোন কালে রচিত হয়েছে, সে কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিলো। সাহিত্য অবশ্যই স্বাধীনতাকে ধারণ ও স্মরণ করে রচিত হয়ে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের যে সর্বগ্রাসী থাবা, তাতে ভারতীয়গণ নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছিল যা তাদের আত্মজাগরণের পথে ধাবিত করেছিল। যে সচেতনতার ফলে তারা এই সমাজ বিপ্লব, আবার কখনো সর্বভারতীয় স্বাধীনতার পথে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এক বলিষ্ঠ বিক্ষোভ ফেটে পড়ে তখন তা আর ভারতীয় ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি ঠেকাতে পারে না। সর্বভারতীয় সেই আন্দোলনগুলো কখনো খেলাফত আন্দোলন, কখনো স্বদেশী আন্দোলন, কখনো আবার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। তবে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনায় এক প্রাদেশিক ভাষা বাংলার কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তার কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেন। যা আজো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যার একটি মাত্র কবিতা শুধু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, শ্লোগান নয়; এক একটি লাইন যেন একেকটি এটাম বোমা, রক্তে ঢালে নতুন হিমোগ্লোবিন, অন্তরে বাজায় বিষের বাঁশি। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর কথা বলছি। যা এক জীবন্ত আদর্শের নাম, শুধু যা রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তন নয়, বিদ্রোহী চিরন্তন মানব আত্মা ও সত্তার চরম প্রকাশ ও বিকাশই যার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। যা ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে রেঁনেসাসের জন্ম দেয়। প্রতিটি মানবিক সত্তাকে বিকশিত করতে চরম সাফল্য ও সার্থকতাকে শীর্ষে নিয়ে যেতে একদিকে আদর্শ হয়ে পথের দিশাও অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নজরুল কাব্য বিদ্রোহী এমনি একটি কবিতা যা মানুষের অতিন্দ্রিয় সত্তাকে আবাহন করে চরমলোকে নিয়ে যায়। তখন এই কবিতার চেতনায় একেকজন মানুষ মানব ও রাষ্ট্র পরিবর্তন অতি মানবে পরিণত হয়ে যায়। মানুষ সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে নির্ভীক চিত্তে থাকেন অনড় অটল। তার এই দৃঢ়তাকে তাঁকে নিয়ে যাবে এক মহিমান্বিত পথে। তিনি হবেন সকল কালের সকল সমাজের সারথি। বিষয়টি কবির ভাষায় উল্লেখ করতে চাই।

'আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুনঃ মহা বিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি, মহাকাল আমি ধূমকেত।' (ধূমকেতু)

যিনি হবেন যুগ ও সমকালের সারথি তিনি যুগের প্রাণপুরুষ মহানায়ক।

একটি আদর্শ সমাজ, তথা একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ হয়ে টিকে থাকেন তিনি বা তার আদর্শ। মানব কল্যাণের নিমিত্তে যদি রচিত হয়ে থাকে তার সৃষ্টিকর্ম বা রাষ্ট্র দর্শন, তবে তা বার বার ফিরে আসবে নতুন আদর্শ হয়ে যুগে যুগে-কালে কালে। যেমন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে রাশিয়ায় যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কালমার্কসের রাষ্ট্র দর্শন মহামতি লেনিন বাস্তবায়ন করলেন। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে ভয়ে কেঁপে উঠলো। আজো বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্য মার্কসের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। ভোগবাদী পুঁজিবাদী বিশ্বের সামনে রঙিন চশমা পরিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের থাবা যারা গোটা দুনিয়াকে রক্তাক্ত করছে এশিয়া থেকে আরব ফিলিস্তিনের গাজায় নৃশংসভাবে। তাদের মৃত্যু ঘণ্টা একদিন বাজবেই। পুঁজিবাদের ভোগবাদের আয়েশী জীবন রঙিন হাতছানি মানুষের উদার মুক্ত চিন্তাকেও মানবিক বিকাশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নানাভাবে শৃঙ্খলিত করেছে। যুগে যুগে তাই নানাভাবে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী লুটেরা শ্রেণি মেহনতি মানুষের প্রতি জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে তাদের অধিকারকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। এজন্য তারা তাদের এজেন্ট দালাল পদলেহি মুৎসুদ্দী শ্রেণি সৃষ্টি করেছে। যারা সাম্রাজ্যবাদীর দোসর হয়ে তাদের শাসন শোষণকে টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা পালন করেছে। এই শ্রেণির পরিচয় কখনো সাম্রাজ্যবাদী, কখনো বুর্জোয়া পতিবুর্জোয়া, মহাজনদের সুদখোর আবার কখনো মধ্যস্বত্ব ভোগী নামেও পৃথিবী জুড়ে পরিচিত। এই শ্রেণির স্বার্থবাদীগণ মানব মুক্তি মানব উন্নয়ন ও মানবতার দুশমন।

যুগে যুগে এদের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব, আইরিশ বিদ্রোহ, তুর্কি বিপ্লব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আর এই সকল বিপ্লব বিদ্রোহে সমকালের কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যার অজস্র নজির দেখানো যাবে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবে যে দুইজন দার্শনিক লেখক ভল্টেয়ার ও রুশো অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা সাহিত্যে তেমনি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।

তিনি কাব্য সাধনাকে অতি সহজেই ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসক শোষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলনে শামিল করে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের কবিতা গানে নতুন ভাব, নতুন ভাষা, নতুন ছন্দ নিজের কাব্য সত্তাকে স্বীয় ভাবে স্বাতন্ত্র্যে গণ মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায় উর্ধ্বে তুলে ধরেন। শাসক শোষকের জুলুম, নিপীড়িন, গণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, প্রেম-দ্রোহ এক বহুমুখী চিত্রনে তার সাহিত্য কর্মের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠে। তার জাতীয়তাবোধ সর্ব ভারতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে সামাজিক, রাজনৈতিক বিদ্রোহ শ্রেণি সংগ্রামের রূপ লাভ করেছে। বিশেষভাবে গণ মানুষের অধিকার বেদনাবোধকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরেছেন, আর এই জন্যই তিনি বলেছেন,

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান'
(মানুষ)

সেই মহীয়ান মানবাত্মার জয়গানে তিনি ছিলেন সদা মুখর। তিনি আবার বলেন,

'মিথ্যে শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন
মন্দির কাবা নাই।'
(মানুষ)

সেই মহীয়ান গরীয়ান মানুষের অধিকার মর্যাদা রক্ষায় তিনি তার কবিতা গানে প্রতিবাদ প্রতিরোধ শুরু করেন। এই প্রতিবাদ প্রত্যাশিত ফলোদয় না হলে তিনি সরাসরি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সরাসরি এ বিদ্রোহ বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত করেছে। তিনি ধূমকেতু পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সুউচ্চ কণ্ঠে দাবী করে বসলেন।

স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী একেক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের তাড়াতাড়ি গুটিয়ে বোচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু বুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।' কবি ও ছান্দসিক আব্দুল কাদিরের ভাষায়:

'এই উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার এহেন অকুতোভয় ঘোষণার বাণী বাংলাদেশের মহাকবির দৃপ্তকণ্ঠেই সবপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিলো।'

নজরুল তার ধূমকেতু পত্রিকায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ভারতবাসী জাগাতে আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা রচনা এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ধূমকেতু অফিসে বিপ্লবীদের আনাগোনা। সব মিলিয়ে এক রাজনৈতিক সামাজিক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করেছিল।

কারণ তাঁর বিদ্রোহ ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক, যার স্বরূপটা অবশ্যই বুঝতে হবে। কবি বলেছেন,

'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন
নিয়ম কানুন শৃঙ্খল
আমি মানি নাকো কোনো আইন

আমি ভরাতরী করি ভরা ডুবি
আমি টর্পেডো
আমি ভীম ভাসমান মাইন।' (বিদ্রোহী)

আর এভাবেই নজরুলের বিদ্রোহের সামাজিক, রাজনৈতিক স্বরূপ সন্ধান করা যায়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, নজরুল ইসলামের সমস্ত কবি জীবনের সদা-জাগ্রত সবচেয়ে দীপ্ত প্রেরণার উৎস শোষণহীন পীড়নহীন এক সমাজ আর সুস্থ মানবতা সম্বন্ধে গভীর এক প্রত্যাশা তার জন্য ক্লান্তিহীন আপোষহীন সংগ্রামের সংকল্প। আর এখানেই তিনি সত্যিকার বিদ্রোহী।

অন্যদিকে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়:

'নজরুল নিজেও জানেন নি যে তিনি নিজে নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন। তার রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে; কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।' নজরুল নিজেও অনেকটা এমনিতর কথা বললেও তা সবটাই মানা যায় না। নজরুর বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহ করেছি বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যা মিথ্যা, কলুষিত পুরাতন পচা, সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কাজেই ব্রিটিশ সম্প্রসারণবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বাঙালি মুসলিমরা হতাশ হলো। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালিদের কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করেনি। ফলে বাংলার জনগণ তাদের ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বঞ্চিত হতে থাকে। আর এমনতর অবস্থায় বাংলার জলপতিত হবে বলে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বর্ষিয়ান নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পাকিস্তানের লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব করেছিলেন। যা শুনে বাংলার বুলবুল কবি নজরুল বলেছিলেন,

'বাঙালিদের জন্য পাকিস্তান হবে না, হবে ফাঁকিস্তান (বা ফাঁকি দেওয়ার স্থান)। কবির কথার প্রমাণ আমরা পেলাম ১৯৪৭; ১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানির শাসকদের শাসনতান্ত্রিক আচরণে। যা সমগ্র বাঙালি জাতিকে হতাশ ও মর্মাহত করেছিলো। বাঙালিকে বুকের তাজা রক্ত দিয়েই মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিলো। যা নজরুল পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। এখানেই তার রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক দূরদৃষ্টি গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত নজরুল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাঙালি জাতিসত্তার এক মহান কারিগর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙালি জাতির সকল জাতীয় দুর্ভোগ ক্রান্তিকালে জাতীয় চেতনার প্রেরণার উৎস নজরুল। নজরুলের সাহিত্যকর্ম তার ঘুম জাগানিয়া অসংখ্য গান কবিতা যুগে যুগে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাহস যুগিয়েছে, শক্তি যুগিয়েছে তার বিখ্যাত গান কাণ্ডারী হুঁশিয়ার যেখানে নজরুল বলেছেন,

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লজ্ঘিত হবে রাত্রী নিশিতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কে আছে জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ। এ তুফান ভারী, দিতে পারি, নিতে হবে তরী পার।'
(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। নজরুল সে ভয়াবহ দাঙ্গা উপশমে একদিকে কংগ্রেস নেতা আর মুসলিম নেতাদের গিয়ে দাঙ্গা থামাতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। দুঃখের বিষয় হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির কাছে তাকে প্রশংসিত না হয়ে তিরস্কৃত হতে হয়েছিলো। তার উদারতা মহত্ব অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে কোন জাতই মর্যাদা মূল্যায়ন করেননি। অথচ স্পষ্টাক্ষরে নজরুল বলেছেন,

'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারী বল ডুবছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'
(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

এভাবে নজরুল ব্রিটিশ ভারতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মাধ্যমে মানবতার জয়ধ্বনি গেয়েছেন। যা অন্য কোন কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

বাঙালি জাতি যখনই কোন ক্রান্তিকালে উপনীত হবে, দুর্ভোগে নিপতিত হবে, তখনই নজরুল চেতনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। কারণ তিনি যে আমাদের চৈতন্যের বাতিঘর, যে অমানিশার আলো, তিমির বিনাশী এক অমলিন ধ্রুবতারা। আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই; কবি বলেছেন:

'আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অবচেতন চিত্তে চেতন,
আমি বিশ্বতোরণে বৈজয়ন্তী মানববিজয় কেতন।'
(বিদ্রোহী)

তার কবিতা গান মানব মুক্তির যে এক শক্তিশালী হাতিয়ার কঠিন মারণাস্ত্র, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আর এই মারণাস্ত্র, বিজ্ঞতাকে বাইরে রেখে ব্রিটিশ শাসকচক্র নিরাপদ বোধ করেননি তারা কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, জুলুম নির্যাতন করেছেন। সেখানেও তিনি শৃঙ্খল ভাঙার গান গেয়ে উঠলেন।

'লাথি মার ভাঙরে তালা যত সব বন্দী শালা
আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।'
(শিকল ভাঙার গান)

সকল কালে সকল যুগে তার কবিতা গান এতটাই প্রাসঙ্গিক যে, যা কখনো পুরানো হবার নয়। কারণ মানুষের যেমন বেঁচে থাকার জন্য খাবার প্রয়োজন, তেমনি সকল প্রকার শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য যুগে যুগে নজরুল চেতনার কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে; এর কোনো বিকল্প নেই। কারণ বাংলাদেশের সম্প্রতি ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার গণ বিপ্লব সাধিত হলো, স্বৈরাচারী

ফ্যাসিস্ট হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে তা এক অভূতপূর্ব বিজয়। এখানে বাঙালি জাতি সত্তার কবি নজরুলের বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতার লাইনগুলো ছাত্র জনতাকে বেশি বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীরা যেমন কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনি ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার গণ বিপ্লবেও প্রায় দুই হাজার গণ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। যুগে যুগে শোষকের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রাণ দিয়ে দাবী আদায় করতে হয়েছে। গণ-মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের চেতনা নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর মৌল সুর। কবি বলেন,

‘মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রনিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত। (বিদ্রোহী

পরিশেষে বলতে চাই; নজরুল কাব্যবিদ্রোহী প্রাসঙ্গিকতা কখনোই শেষ হবার নয়। কারণ পৃথিবীতে শোষক শোষিত দুটি শ্রেণি থাকবেই মানুষ যুগে যুগে মুক্তির যে গান গাইবে, মুক্তির যে মন্ত্র উদ্ভাবন করবে, সেখানে নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর চেতনার কাছে ফিরে যেতে হবে। সকল শোষণের নাগপাশ ভাঙতে। তাই নজরুল কাব্য বিদ্রোহী সকল যুগেই বাঙালি জাতি তথা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কাছে এক প্রাসঙ্গিক কাব্য সত্তা।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: শতবর্ষে অমলিন

পরাধীন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ব্রিটিশের অত্যাচার অবিচার শোষণ বঞ্চনা অতিষ্ঠ করে তোলে ভারতীয়দের। ফলে, ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হতে থাকে। তাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে। ভারতবর্ষে কংগ্রেস (১৮১৭), মুসলিম লীগে (১৯০৬) জয় লাভ করে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠে অভিনব ভারত, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতি, বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে (১৮৮০-১৯৫৯) যুগান্তর সমিতি। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে তারকানাথ (১৮৮৪-১৯৫৮) ও সহযোগীদের চেষ্টায় হয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয়। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা জাপানে বিপ্লবীদের রাসবিহারী বসুর (১৮৮৬-১৯৪৫) নেতৃত্বে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। পাঞ্জাবে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠে বিপ্লবী ফাদার পার্টি। এতে সারা ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

স্বদেশী, স্বরাজ-অসহযোগ ও সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ব্রিটিশ রাজ। এদিকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মহামতি লেলিনের (১৮৭০-১৯২৪) নেতৃত্বে সংঘটিত হলো রাশিয়ায় রুশ বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কামাল আতার্তুকের নেতৃত্বে (১৮৮১-১৯৩৮) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে সাধিত হলো তুর্কি বিপ্লব। যা তুরস্কের খেলাফত বিলুপ্ত করে ধর্ম নিরপেক্ষ এক আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠা করেন কামাল আতাতুর্ক সমগ্র পৃথিবী এক অস্থির তালমাটাল অবস্থা চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৯।

এমনি কাল প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কালজয়ী কাব্য গ্রন্থ (১৯২২) অগ্নিবীণার প্রথম প্রকাশ। শুধু কাব্য ক্ষেত্রে নয় রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিপ্লবী চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় ১৯২১ থেকে ২০২২ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যার পঠন পাঠনে ও জাতীয় চেতনায় আমাদের জাতি ক্রান্তিকালে সকলক্ষেত্রে এই শতবর্ষেও অমলিন হয়ে আছে। এখনও বাঙালি জাতি নজরুল কাব্যের চেতনা ধারায় দুর্ভোগ ঘোচাতে ফিরে যায় বারবার। এবং ফিরে যেতেই হবে, কারণ আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এক মহান আদর্শ হয়ে, কবি বলেছেন,

‘আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু।
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।’
আমি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি সৃষ্টির ঐ চাতুরী
তাই বিধি নিয়মে লাথি মারি, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।
আমি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও
তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দেই গোঁফে তাও।’

বিপ্লবীরা জগত সংসারে নানা রূপে নানা পরিচয়ে বারবার ফিরে আসবেন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে। যখন কোন সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতি দুর্ভোগ সৃষ্টি হবে, গণ মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হবে; তখনই কোন না কোনোভাবে বিপ্লব দানা বেঁধে উঠবে। নজরুল নিজে বিদ্রোহীদের নিয়ে গান কবিতা রচনা করেছেন। বিপ্লব জাগরণে মুখরিত হয়েছেন। তিনি মহামতি লেলিনের রুশ বিপ্লব, কামাল পাশার তুর্কি বিপ্লব, সুভাষ চন্দ্র বসু, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নজরুল তার অসংখ্য কবিতা গানে। কারণ বিপ্লবীরা তার কবিতা গানের প্রেরণার উৎস, উপজীব্য দেশ দেশের মানুষ।

গণমানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টিতে যে বিধাতা নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে, তিনি তার বুকে লাথি মারতেও কুণ্ঠিত হননি।

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।'

যে বিধাতা তাঁর ভক্ত তাঁর আরাধনা করে তার অভাব অভিযোগ দেখেন না তিনি তাকে জাগাতে, স্মরণ করিয়ে নিতে বুকে পদাঘাত করতে কুণ্ঠিত হননি। কবি এই অন্ধ স্রষ্টার জন্য শনি হয়ে দেখা দিবেন বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

'আমি এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।'
(ধূমকেতু)

বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এক আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যা কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তা বিদ্রোহী সত্তার বিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল গবেষক সমালোচক হারুণ অর রশিদ বলেছেন, নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার বিকাশের পেছনে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কারণ যাই থাকুক হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের অবদানও রয়েছে। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের বিপ্লবী চেতনা নজরুলকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। নজরুল সাহিত্যের মূল ভূমিকা বলা যেতে পারে নজরুল কাব্যে বিদ্রোহীকে। এই কবিতায় তার অসাধারণ তেজোদীপ্ত ও শক্তিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে তাই বিদ্রোহী শতবর্ষেও অমলিন হয়ে আছে।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী শতবর্ষের সর্বোচ্চ মিনারে ঘোষিত এক কণ্ঠস্বর। যা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের সতর্কবার্তা রূপে বজ্রধ্বনি হয়ে বাজছে আজো। বিদ্রোহী কবিতা লেখা হয়েছিলো ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এবং তা ২৫ ডিসেম্বর বড় দিনের ছুটিকালেই। শীতকালে বৃষ্টিস্নাত রাতে নিজের আরামের ঘুমকে হারাম করে কবিতার অমর সৃষ্টি রাত জাগা পাখির মত কলমের খোঁচায় বিশ্বনন্দিত বিদ্রোহী কবিতাটি রচনা করলেন। নতুন ভাব ভাষা ছন্দ অভিনব এক মহাকাব্য। একুশ বছরের এক তরুণ যুবা মনে প্রাণে তার নতুন সুর ও স্বরের প্লাবন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষ সপ্তাহে লিখে ফেললেন বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বীরত্বব্যঞ্জক সবচেয়ে তেজোদীপ্ত সমকালের শিকল ভাঙার গান। যা সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতা শহরের তালতলার ৩/৪ সি তালতলা লেন কলিকাতা ১৪। যেখানে কবির স্মৃতিফলক আছে। যেখানে থাকতেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ। ছোট একটি চৌচালাঘর দুপাশে দুটি তক্তপোষ বা চৌকি একটি নজরুল অপরটিতে বিপ্লবী মুজাফ্ফর আহমদ। ঠিকানাটি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলো। এখানেই কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা আসতেন। জায়গাটি হিন্দু মুসলিম সকল জাতির মিলন তীর্থে পরিণত হলো। যা আজ ভূগোল ইতিহাসে মিলে এক মোহনার এক পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। সে কবিতা যেন পবিত্র এক ঐশীবাণীর মত বাঙালির প্রাণের স্পন্দনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর মহিমা থেকে মহিমান্বিত স্থানের অধিকারী হয়েছে। এভাবে কবির বিদ্রোহ আর বিদ্রোহী মিলেমিশে এক মানসলোক সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কাব্য জগতে।

কোলকাতার ৩/৪ সি তালতলার লেনের নিচ তলার দক্ষিণ পূর্ব কোণের বাসায় কাকাবাবু মানে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মধ্য বয়সী বিপ্লবী কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ। নজরুল যাকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন, যদিও ঘরসহ ভাড়া নিয়েছিলেন, কুমিল্লা জেলার জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর দৌহিত্রগণ। এই একটি মাত্র ঘরেই মহান বিপ্লবী কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের (কাকা বাবু) সাথে পাশাপাশি চৌকিতে থাকতে হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের এই মহান কবিকে। পার্টির কাজে ব্যস্ত থাকা কাকা বাবু রাত দশটায় ঘুমিয়ে পড়লেন। আর রাত জেগে সৃষ্টি হলো বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি বিদ্রোহী কবিতা। যার প্রথম শ্রোতা হলেন কাকাবাবু। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ (কাকাবাবু) ছিলেন স্বল্পবাক শান্ত বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ। তিনি সামনাসামনি সৃষ্টিশীল কাজে তাকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি নজরুলকে পিতামাতার মত স্নেহ মমতায় আগলে রেখে এই একুশ বছরের তরুণ যুবাকে উৎসাহিত করেছেন। মূলত বিদ্রোহী কবিতার সূতিকাগার কাকা বাবুর সেই তালতলার সি ৩/৪কলিকাতা-১৪ বাসাখানি। বিদ্রোহী কবিতা রচনায় নজরুলের প্রতি স্নেহশীল আচরণে কাকাবাবু তার প্রতি একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বিদ্রোহী কবিতাসহ নজরুল কাব্য রচনা প্রকাশনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন এই সর্বহারার বিপ্লবী নেতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ। দিন রাতের সৃষ্টির প্রথম শ্রোতা তিনি। তিনি নিজে ধন্য নজরুলকে করেছেন অশেষ ঋণে ঋণী। বয়সের ব্যবধান তাদের স্নেহ ভালোবাসার শ্রদ্ধার বন্ধনে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিদ্রোহী কবিতার চাহিদা বা পত্রিকার ভাষায় বলে কাটতি এমনি হলো যে, একদিনেই দুজন সম্পাদক দুটি কপি নিয়ে এলেন, সি তালতলার বাড়িতে প্রথম সম্পাদক আফজালুল হক, দ্বিতীয় জন বিজলী সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। একটি কবিতার এত চাহিদা, ভাবা যায় একেই বলে কবিতার ভাগ্য, কবির ভাগ্য যে কবিতা রাতে লেখা হলো, তা পরদিন ছাপতে সম্পাদক ঘরের মাঝে রীতিমত মনোক্ষুব্ধ আর কি। শুধু বাংলা কবিতা কেন ভারতীয় হিন্দি-উর্দু-ফার্সি, ইংরেজি

কোন কবিতার ছাপার ইতিহাসে এমনটি ঘটেছে বলে যায় না। ছাপার প্রতিযোগিতা পর্বেই কবিতা এত গুরুত্ব পেয়েছিল। ছাপার আগে, পাঠকের হাতে যাবার আগে দুজন সম্পাদকের এমনি উদ্যোগ দেখে মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা কবির রাত জাগের শ্রম সার্থক করেছেন। মুসলেম ভারত সম্পাদক আফজালুল হক ও বিজলী সম্পাদক অবিনশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য। বিদ্রোহীর ভাব ভাষা ছন্দের নতুনত্ব ও মুসলিম এবং ভারতীয় মীথের অপূর্ব ব্যবহারে বাংলা কবিতার এক অপূর্ব সৃষ্টি যেন বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর কীর্তি দেখে অবিনশ্বর বাবু ২২ পৌষ ১৩২৮ বাংলা ৬ জানুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছাপা মুসলেম ভারত নয় বিজলীতে ছাপানো হয় এক সপ্তাহে দুবার। বিজলীতে ছাপার ফলে বিজলীর কাটতি আরো বেড়ে গেলো। বিদ্যুত গতিতে দ্রুত পাঠক সমাজে বিদ্রোহীর সুর ঝংকৃত হতে থাকলো। বিদ্রোহী কবিতার চাহিদা বেড়ে গেলো ঝড়ের মতো, তুফানের গতিতে সাইক্লোনের মত। পাঠকের কাছে এত কলরোল কোলাহল জেগে উঠলো বাঙালি পাঠক সমাজ।

'আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন
আমি কলরোল কল কোলাহল।' (বিদ্রোহী)

বাঙালি পাঠক সমাজে নজরুল কাব্যের দ্রুত জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, এতে কবিরও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম ফলে হয়ে উঠলেন বাঙালির প্রিয় বিদ্রোহী কবি। কবিতায় কিছু শব্দ, কিছু কথা, কিছু ভাব সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককে তাড়িয়ে তুললো। তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভাবতে থাকলো বিদ্রোহী কবি, কবিতার পাঠক, গোটা বাঙালি জাতিকে। চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হলো, ব্রিটিশ সরকারের অপতৎপরতা আরো বেড়ে গেলো। যেদিকে অন্যান্য পত্রিকাতেও বিদ্রোহী একের পর এক মুদ্রিত হতে থাকে: প্রবাসী (মাঘ-১৩২৮), সাধনা (বৈশাখ-১৩২৯), ধূমকেতু (২২ আগস্ট-১৯২২)সহ আরো অনেক পত্রিকায়। বিজলীর পর ভারতের অসংখ্য নামীদামী পত্রিকায় বিদ্রোহী ছাপা হলে বাংলা সাহিত্য তথা ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকলো। কবিতায় রাজনীতির গন্ধ পেয়ে ব্রিটিশের গোয়েন্দাগণ ধূমকেতু ও নজরুলের পিছু লাগলো আঠার মত।

অগ্নিবীণা কাব্যের অনবদ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বিদ্রোহী মেহনতি কৃষক শ্রমিক মজুর শ্রেণির প্রতি ব্রিটিশ শাসক শোষক শ্রেণি যে জুলুম নিপীড়ন করেছে তা কবিকে বেদনা বিদুর করেছে, আহত করেছে, মর্মাহত করেছে। কবি যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছেন সুন্দরের ধ্যান করেছেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অত্যাচার তার সে স্বপ্ন ধ্যান ভঙ্গ করেছে। এক কথায় স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনা বোধ তাঁকে আহত করেছে, তাঁর রোমান্টিক স্বপ্ন সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করেছে শোষকের নির্যাতন। জন্মের পর থেকে তিনি এক সুখী সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন; যে স্বপ্ন আজো বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি বিদ্রোহী অভিধাটি তার নামের সাথে বিশেষণ হিসেবে যুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মনে সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও ধর্মান্ধদের মনে এক ভীতির সঞ্চার করছিল। তাঁর এই বিদ্রোহ শুধু যে কথার কথা তা নয়; এটি তার ব্যক্তি মানস ও সাহিত্য মানসও বটে। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে কোনো কবিতা নিয়ে এতো আলোচনা সমালোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। বিদ্রোহী স্বদেশী বিপ্লবীদের যেমন শক্তি সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস; তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক, সুদখোর মহাজন, ধর্মান্ধ হিন্দু মুসলিম এমনকি শিক্ষিত এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন যা সত্যি দুঃখজনক। বিদ্রোহী প্রকাশিত হলে সমগ্র বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গে সাড়া পড়ে যায়, দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে লেলিহান শিখা, পুড়তে থাকে সাম্রাজ্যবাদের শাসনমন্ত্র। বিদ্বেষবশত তাঁর খ্যাতিকে সহ্য করতে পারেননি শনিবারের চিঠির লেখক দল। তাঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাশ ও কবি মোহিত লাল মজুমদার। কবি মোহিত লাল মজুমদারতো বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে লিখলেন ব্যাঙ কবিতা

'আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব বরষে বরষা আসিলে
ডাকি যে ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ
আমি ব্যাঙ
আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই।
আমি বুক দিয়া হাঁটি, ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।' (ব্যাঙ)

শনিবারের চিঠিতে কতিপয় সাাহিত্যিকগণ নামধারী মেকি মিথ্যা ব্যাঙ ঠাট্টা তামাশা প্রভৃতি উড়িয়ে দিয়ে রুচিহীন মানসিকতা ঠেকাবার জন্য নাকি সজনীকান্ত দাশের অভিপ্রায় ছিল, বললেও আত্মস্মৃতিতে তিনি জানালেও তার প্রতিটি প্যারোডিতে তিনি ও নজরুল বিদ্বেষীরা নিজেদের রুচিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে সজনীকান্ত দাশ, কবি মোহিত লাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী যে অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগে তারাই অভিযুক্ত হয়ে যান। বরং নজরুল তার বিদ্রোহী কবিতায় ভাব ভাষা ছন্দ, চেতনা সবক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব, ব্যতিক্রমী এক নতুন সংযোজন। মূলত বিদ্রোহী কবিতার ভাবে ছন্দে যে চেতনাগত আবেগ তৈরি হয়েছে তা ঐ প্যারোডি রচয়িতাদের প্যারোডিতে নেই। মোহিত লাল মজুমদার ও সজনী কান্ত দাশেরা বিদ্রোহীর ধারে কাছেও যেতে পারেননি। বিদ্রোহী কবিতাকে সজনী কান্ত দাশের বিদ্রোহীর প্রলাপ বলার কোনো সমালোচনাগত যৌক্তিকতা নেই; এমন অধিকারও নেই। বিদ্রোহী পাঠে কেমন আবেগ উত্তেজনা তৈরী হয় দেখুন:

'বল বীর/বল উন্নত মম শির।
শির নেহারী আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর/আমি চির বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি আমি একা চির উন্নত শির।' (বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল 'আমি' সর্বনামের ব্যবহার করেছেন মোট ১৪৫ বার। আর হুইটম্যান তার কবিতায় 'আই' শব্দের ব্যবহার করেছেন চারশতাধিকবার।
ইংল্যান্ড ও আমেরিকার কবিরা যখন আমি উচ্চারণ করেন কবিতায় আই ব্যবহার করেন, তা তাদের শুধু ব্যক্তি সত্তাকেই বোঝায়, পক্ষান্তরে লুই আরাগ যখন বলেন আমি কে আমির অর্থ আমরা বা সমষ্টিগত সমাজ গোটা ফরাসি দেশের বীর জনতা সে আমির সাথে মিশে থাকে।

নজরুলের বিদ্রোহী তেমনি গোটা ভারতবাসীসহ বিশ্বের নিপীড়িত গণ মানুষের আত্মউত্থান সহ দেশজ ভাবনায় তাড়িত। বিদ্রোহী শুধু ব্যক্তিসত্তায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে সমষ্টিগত সত্তার পরিপূর্ণ রূপায়ন। নজরুলের বিদ্রোহী সম্পর্কে ৬ জানুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর কবি গেলেন ১৭ জানুয়ারি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি জোড়াসাকোতে। গিয়েই চেঁচাতে লাগলেন, গুরুজী! গুরুজী! কোথায় গুরুজী?

– কবি ষাড়ের মত চেচাচ্ছো কেন?

নজরুল বলল, আপনাকে হত্যা করবো।

– উপরে এসো শান্ত হয়ে বসো।

– বসুন শুনুন।

বিদ্রোহী কবিতাখানি বিশ্ব কবিকে স্বকণ্ঠে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ বললো, 'তুমি আমাকে সত্যি হত্যা করবে আমি মুগ্ধ। তুমি বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, আলোকিত হোক তোমার কবিতা।' এই বলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। সাময়িক শুধু স্থান নয়, হৃদয়ের একান্ত গভীরে স্থান দিলেন চিরবসন্তের কবি নজরুলকে। রবীন্দ্র-নজরুলের চিরসখ্য গড়ে উঠে, নবীন প্রবীণের আত্মীয়তায়, নতুন আর প্রাজ্ঞের হলো মহামিলন। একাকার হলেন এই কবি এক বিন্দুতে, তারুণ্য গাম্ভীর্য মিলেমিশে বিশ্বমননের আকাশে। কবি গুরু নজরুলের এ সাক্ষাৎ কোন কাল্পনিক নয়, বাস্তব সত্য। যা একাধিক স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কখনো গুরুজী আবার কখনো গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কাজী বলে ডাকতেন। রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কের গুরুত্ব এতটাই যেতে চায় যে, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় নজরুলের এক বছর কারাদণ্ড হলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তাঁর বসন্ত গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন, আর নজরুল তার প্রিয় গুরুজীকে সঞ্চিতা কাব্য সংকলনটি উৎসর্গ করেন। গুরু শিষ্যের এই কাব্যগ্রন্থ লেনদেনের ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যা আজো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। বিদ্রোহী কবিতায় হিন্দু পুরাণের ব্যবহারঃ বেদ পুরান, উপনিষদ, গীতা মহা ভারতের ব্যবহার যেমন করা হয়েছে; তেমনি ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য কোরান হাদিসের, এমনকি বাইবেলসহ বিশ্ব মীথের ব্যবহার করা হয়েছে। বিদেশি শব্দমালা এমন সার্থক ব্যবহার কোন কবির পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমকে সম্প্রীতির একটি মাধ্যম হিসেবে বিশ্ব ঐক্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। এক কথায় বিচিত্র মীথের ব্যবহার প্রাণে এক সম্মিলিত জোয়ার সৃষ্টি করে যা কোনো একক শক্তি নয়, মহা অভিযানের, মহা বিজয়ের সূচনা করে, যার আহ্বান বিদ্রোহী কবিতায় রয়েছে। বিদ্রোহী কবিতায় ১৪টি স্তবক, পঙক্তি রয়েছে ১৪১, কবিতার প্রথমাংশে 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' পাঁচ বার, 'আমি' সর্বনামের ব্যবহার আছে ১৪৫ বার। এখানে প্রাণের গতিবেগ, প্রবল প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস, মানব হৃদয়ের আমিত্বকে দীপ্তিতে উজ্জ্বল করেছে। বিদ্রোহী কবিতা, সঞ্জিবনী শক্তি জ্বলন্ত লাভার মত জড়ত্ব মুক্ত করার এক মহামন্ত্র। মোহিত লাল মজুমদারের আমির মত নয়। এ এক মহাশক্তি, যা আরো গতিময়, আরো বিস্তৃত। যা পরাধীন ভারতের অন্তরের বিষজ্বালা আর শোকের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার হাতিয়ার শুধু নয়, গণ মানুষের মহাশক্তির বিস্ফোরণ। স্বাধীনতার জন্য সাহসী বীরের প্রয়োজন। সেই বিরাট আমির স্বার্থে লুকিয়ে আছে, বিদ্রোহী সত্তা, যা শুধু পৃথিবী নয়, সমগ্র আকাশ বাতাস, সমগ্র সৃষ্টিকেও বিদীর্ণ করতে পারে। যাকে বলা যেতে পারে এটমিক পাওয়ার।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী, ১৯২১ ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে লিখিত এবং ১৯২২ খ্রি. জানুয়ারি ৬ তারিখে সাপ্তাহিক বিজলী প্রথম প্রকাশিত; পরে আরো অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে একশ বছর। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন শোষণ পুঁজিবাদী সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী সামন্ত প্রভুগণ তাদের পদলেহনে ব্যস্ত। ধর্মের নামে নানা মতবাদ অন্ধত্বই গ্রাস করেছিল ভারতীয় ধর্মবিদদের। সর্বোপরি দারিদ্র্য মানুষকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, যদিও আজো সর্বহারা মেহনতি গণমানুষের মুক্তি আসেনি। ঠিক এমনি সময়ে বিদ্রোহী কবিতা সমগ্র বাংলাদেশ, বাংলা ভাষায় ও পরাধীন ভারতের এক আত্মজাগরণী মন্ত্র নিয়ে বাঙালির পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্রোহী কবিতা ভারতবর্ষের শুধু সাহিত্য জগতে নয় বরং সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক জগতেও এক বিপ্লবী দ্যোতনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলো। বাঙালির সকল ক্রান্তিকালে বিদ্রোহী যেন গণ মানুষের মনে এক অভিঘাতের ধারা নিয়ে আসে। এক বছরে বিদ্রোহীর রূপ বদলেছে; কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা অবিকল রয়ে গেছে। বিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্রোহী এক দারুণ শব্দ, বিপ্লবীদের কাছে। তাই শাসক শ্রেণি বিদ্রোহীকে সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখে থাকে। সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী কবিতা পাঠে এক সম্মোহনী শক্তি অর্জন করে। বিদ্রোহী কবিতা আমাদের বাঙালির জাতীয় জীবনে দ্রোহের সামাজিক সাংস্কৃতিক মানস গঠনে মীথের ভূমিকা পালন করেছে। সকল স্বৈরাচার বিনাশে আন্দোলন সংগ্রামে বিদ্রোহী যেন নিয়ামক শক্তি। বিদ্রোহী কবিতার গুরুত্ব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজ বিশ্লেষক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছেন 'আমরা বিদ্রোহী কবিতা পাঠে একেকজন অতি মানুষে রূপান্তরিত হইবো। ভীরু দুর্বল ভারতবাসীকে জাগাতে নজরুল আমাদের অবলম্বন।' ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক গবেষক হ্যানরি গ্লাসি বলেন, 'বিশ শতকের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে বিদ্রোহী (১৯২২) ডব্লিউ বি ইয়েটস-এর সেকেন্ড কামিং এবং টিএস ইলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড।' বিশ শতকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

(১৯১৪-১৯১৯), ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় মেহনতি শ্রমিক শ্রেণির সমাজ বিপ্লব, অবক্ষয়, অমানবিকতা ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, ২য় বিশ্ব যুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৭) চলাকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসন বিশ্ব সাহিত্যকে আরো বেশি সংবেদনশীল করে তোলে। বিশেষ করে কবিতায় মানব মুক্তির সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়। আর মানব মুক্তির অরোধ্য মানসিকতা থেকেই কবিতায় যে বিপ্লবী চেতনার প্রয়াশ লক্ষ্য করা যায় তারই চরম বহিঃপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যের অজর অমর সৃষ্টি বিদ্রোহী কবিতা। বিদ্রোহী কবিতায় পরাধীন জাতির যে নাগপাশ থেকে মুক্তির আহ্বান, শোষণ বঞ্চনার শৃঙ্খল ছিন্ন করার যে মূলমন্ত্র তা মহাকাব্যের চিরন্তন ঐশ্বর্য ও আবেগে দীপ্যমান। আর একারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন, তোমরা নজরুলের কবিতা মনোযোগ দিয়ে পড়োনি। পড়লেও হৃদয় দিয়ে অনুভব করোনি। যে কবিতা যুগের দাবী মেটায়, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।'

বিদ্রোহী এক মহা আদর্শিক কবিতা; যা সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে মহা পুরাণিক শব্দের ব্যবহারে সামঞ্জস্যপূর্ণ মীথের ব্যবহারে সমৃদ্ধ হয়েও তা হয়েছে মহাজাগতিক। মানব মুক্তির হাতিয়ার, চিরায়ত বিশ্ব সাহিত্যের সর্বকালীন মর্যাদার অধিকারী।

নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও তার মায়াজাল ভেঙে বেরিয়ে এলেন, নতুন যুগের সূচনা করলেন। যে যুগ নতুনের চির তরুণের যার রয়েছে বলদৃপ্ত আবেগের গর্জনে, ঘুম ভাঙিয়ে দেবার অমিত বিক্রম তেজ। নজরুল কাব্যের বিদ্রোহী সত্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেন, নজরুলের দোষত্রুটি সুস্পষ্ট কিন্তু তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে উঠে। সব সত্ত্বেও একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। তিনি আরো বলেন,

'কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন যা থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছাটাকে অন্যায় মনে হতো, যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সতেন্দ্রনাথের তন্ত্র ভরা নেশা তাঁর বেলোয়ারী আওয়াজের আকর্ষণ তাও জেনেছি। আর এই নিয়ে বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার আর অন্য কিছু চাইল না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না, যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।'
(রবীন্দ্রনাথ উত্তর সাধক, বুদ্ধদেব বসু- প্রবন্ধ কলিকাতা-এপ্রিল-১৯৬৬)

বাংলা কবিতার বিচার বিশ্লেষণে বিদ্রোহের যে প্রথম উচ্চারণ, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যে। চিরাচরিত বিশ্বাস প্রথার বিরুদ্ধে, অবতার মহিমার বিরুদ্ধে নতুন মূল্যবোধের আলোকে ধারণাতীত। কিন্তু নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে বিষয় প্রকরণ, সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে এতই স্পষ্ট যে এমন ধ্বনি গাম্ভীর্য, যা সাধারণ পাঠক শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যায় প্রাণে প্রাণে ঝংকার তোলে, প্লাবনের জোয়ার বয়ে যায়। চিরবিদ্রোহের এই যে দৃশ্যময়, ধ্বনিময়, আবেগময় প্রকাশ; যা অদ্বিতীয় অতুলনীয়। আর সে কারণেই শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়; বিশ্ব সাহিত্যে বিদ্রোহী কাব্য অমলিন হয়ে আছে। আধুনিক বিশ্বের পাঠকের কাছে বিদ্রোহীর যে রূপ তা চির নতুন ও শাশ্বত রূপে আজো বিবেচিত।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহীঃ বিশ্ব সাহিত্য

একজন লেখকের লেখায় যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার শাসন শোষণ, সমাজ ব্যবস্থার চিত্র, গণ-মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না ঘটে; তবে বুঝতে হবে তিনি সমাজ বিমুখ, ক্ষুদ্র হৃদয়ঘটিত ব্যাপারই তার লেখার মুখ্য প্রয়াস। লেখকের লেখায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার অসঙ্গতি, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভেতর থেকে আপনাকে আলোড়িত করবে, নৈতিকভাবে তাড়িত করলে বুঝতে হবে, ঐ সাহিত্যকর্মে গণমানুষের মুক্তির মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে। আর এ কারণেই এরিস্টটল বলেছিলেন, 'কবিকে অবশ্যই রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করা শ্রেয়; কেন না সাহিত্য ও শিল্প চর্চার অন্যান্য মাধ্যমের থেকে কবিতা ও সঙ্গীতের প্রভাব ও উত্তেজনা অনেক বেশি জনমুখী। তাই তাকে নিয়ে রাষ্ট্রের মাথা ব্যথার হাজারো অবকাশ আছে।' যে সাহিত্যকর্ম নিয়ে এরিস্টটলের মাথা ব্যথার কারণ আছে, বুঝতে হবে সেখানে বিশ্ব মানবের আশা-ভাষা সর্বোপরি মুক্তির বারতা আছে। সাহিত্যে সমকালীনতা থাকবে; কিন্তু তাতে যদি বিশ্ব মানবের করুণ আর্তস্বর জুলুম নিপীড়নের কথা থাকে, তা থেকে মুক্তির প্রয়াস থাকে, তখন তাকে অবশ্যই মানবিক সাহিত্য বা মানবতাবাদী বলতে হবে। দার্শনিক ইউলিয়াম ফকনার বলেছেন, মানবতাবাদী না হলে কেউ লিখতে পারে না। কথাটি অনেকাংশেই সত্য। তাই বিশ্বে মানবতাবাদীগণের সাহিত্যই যুগে যুগে বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশকাল ও বিশ্ব সাহিত্য নিয়ে নজরুল কি বলেনঃ তিনি শুধু ধর্মীয় নয়, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ স্বীকার করেননি। তার কথায় ' আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই, শুধু এই দেশের এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। যে কুলে, যে সমাজে, যে বংশে যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করি, সে আমার দেশ। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।' সমাজ ও জাতীয় জীবনে সাম্য উদারতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই তার জীবনের মৌল প্রেরণা ও সাহিত্যের লক্ষ্য। এ যুগে তাঁর কবিতায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ খুঁজে না পেয়ে সমালোচনা করতে পারেন; কিন্তু তখন সর্বহারার রাজনীতি এই শব্দ প্রচলিত ছিলো না। তবে নজরুল প্রচারাদীর উর্ধ্বে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নে সমর্থ হয়েছিলেন তা বলা যায়।

তার সাহিত্যকর্মের সাম্য ভাবনা ও মানবমুক্তির প্রত্যয় বার বার ঘোষিত হয়েছে। আর এ কারণেই কেউ কেউ তাকে সমকালের কবি বলতে, যুগের কবি বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। যিনি যুগের দাবীকে পূরণ করেছিলেন বলেই তিনি যুগের কবি। আর সমকালের হয়েই তিনি চিরকালের সর্বকালের কালজয়ী। চিরকালের বিশ্ব মানবের রেখে গেছেন তার অমর সৃষ্টি শাশ্বত অমর বাণী। সুতরাং তিনি কালের কবি একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণ; যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন তাঁর সাহিত্যকর্ম থাকবে তার চৈতন্যের কাছে বার বার ফিরে যেতে হবে। তার প্রয়োজন ফুরোবে না, কারণ তিনি যুগে যুগেই প্রাসঙ্গিক–

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু।
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল, ধূমকেতু (ধূমকেতু)।

বর্তমান বিশ্ব সাহিত্যে নজরুলের অবস্থান কোথায় নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়। যুগের অঙ্গিকারনামায় যে স্বাক্ষরই বিবৃত থাকুক না কেন, গানের পাখি তাঁর স্বভাব, ধর্ম বিস্মৃত হতে পারে না। কেন না গান গাওয়াই যে তার ধর্ম। নজরুল তার বিশ্ব সাহিত্যের রূপ দর্শনে দীর্ঘকাল পূর্বেই বিপরীতধর্মী রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

বর্তমান বিশ্ব সাহিত্যের দিকে একটু ভালো করে দেখলে সর্বাঙ্গে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলির Skylark-এর মিল্টনের Bird of paradise এর মত এই ধুলিমলিন পৃথিবী থেকে স্বর্গের সন্ধান করে তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি উর্ধ্বে, এরা উর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন বিহারী। আর একরূপ সে মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আকড়ে ধরে থাকে, অন্ধকার নিশীথে ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে, তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে ধরে থাকে তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।'
(বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য নজরুল রচনার পৃষ্ঠা-৬৮)

নজরুল বিশ্ব সাহিত্যের মহৎ সৃষ্টিশীল মনীষীদের রচনায় তার এই প্রকৃতিকে তার কাব্যিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যা নজরুলের ভাবাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রচনার প্রকৃতি, বিষয়বস্তু আবেদন, মানব প্রবণতার নিরিখে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের রূপ রেখার পরিচয় তুলে ধরেছেন। সাাহিত্যে ঐতিহাসিক বিবর্তন, সভ্যতার ক্রমাগ্রগতি, চিন্তা ধারা প্রসূত বিপ্লব সাহিত্যের নাতিধারাকে পরিবর্তিত করলেও শিল্পসত্তার যে মৌলিক প্রেরণা ও প্রবণতা তা যেহেতু স্বপ্নচারী ও সঙ্গীত বিলাসী; দ্বিতীয়ত মাটির সান্নিধ্য প্রয়াসী তাই এ দুয়ের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশের সর্বজয়ী আকাঙ্ক্ষা; আরণ্য বা স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ মুক্ত বিহঙ্গের সুমধুর ধ্বনি সুরস্রোত প্রবাহিত করে, শিল্পসৃষ্টির এ সূর্য তত্ত্বকণা ও চিরন্তন সত্যবাণী উচ্চারিত হয়েছে নজরুলের কণ্ঠে।

'ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তবগান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশি, তুরস্কের নেকাবপরা মেয়ের মোমের মত দেহ। কখনো চারপাশে কাদা ছোড়াছুড়ির হোলি খেলা চলে আমি স্বপনের ঘোরেই বলে উঠি Thou wast not born for death, immortal bird! (বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য)।

কবি আত্ম মুগ্ধতায় নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন; কিন্তু বিশ্বসংসার বিশ্ব সংসারের অব্যক্ত নিপীড়ন তাঁকে ধ্যানমগ্ন তাপসের মত আত্মসমর্পণ করতে দেয়নি। নজরুলের ভাষায়ঃ বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বার বার কেড়ে এনেছে, সেই মৌনীর কোল থেকে নিগড়ের পর নিগড় আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে; আমিও বারে বারে ছিন্ন করেছি সেই বন্ধন। বারে বারে পালিয়ে যেতে

চেয়েছি; সেই পরম একাকি শান্ত সমাধিতলে এবং দোটানার দুঃখ হতে মুক্ত হতে আমি আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি।

(মধুরম, নজরুল গল্প সম্ভার-১৪০)

নজরুল বিদ্রোহী সত্তার জয়গান গাইতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে আর্টের নিয়মনীতি লংঘন করেছেন; কিন্তু তিনি জানতেন যে বিদ্রোহ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়, যুগ প্রয়োজনে শিল্পীসত্তার বিরুদ্ধে। কারণ নজরুল Moral excellence সৃষ্টি করার জন্য ছিলেন উৎসর্গিকৃত। তাই প্রাচ্যের কবি হুইটম্যানের সুরে তিনি বলেছেন, Behold I do not give charity when I give. I give myself.

নজরুল দেশকে যেমন ভালোবেসেছেন, তেমনি ভালোবেসেছেন দেশের মানুষকে। এই গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসার জন্যই তাঁর কবিতা গানে গণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসি কান্না, দুঃখ বেদনা মর্মস্পর্শি ভাষায় ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতায় দেশের নির্যাতিত মানুষের বেদনার কাহিনি যেমন রূপায়িত হয়েছে তেমনি রূপায়িত হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে নতুন চেতনায় সঞ্জিবনী সুধা, সংগ্রামী মানুষের কাহিনিতে।

বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য রয়েছে তার প্রবন্ধে। সমকালীন বিশ্ব ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক অবস্থার সচিত্র সমাবেশ বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর (পৌষ ১৩৪০) সংখ্যায় বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য প্রবন্ধটিতে বিশ ও ত্রিশের দশকের বিশ্ব সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। নজরুল বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তার স্থান কতটা বিস্তৃত তার বর্তমান কাব্য সাহিত্য পড়লেই সহজেই অনুমেয়।

বিশ্ব শান্তি ও মানবিকতায় বাঁধ সাধে যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদী মানসিকতা। ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী মানুষদের অহংকার পাশবিকতার আজো সমাপ্তি ঘটেনি। মানবিক চেতনার বিকাশ ও তার প্রতিষ্ঠায় গণ সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। কাজেই গণ সাহিত্যেই একমাত্র নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন নজরুল ও মানবিক সাহিত্য স্রষ্টাগণ। সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নজরুল কাব্য ও সাহিত্যের মৌল প্রেরণারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এ কারণে কোন কোন সমালোচক তাকে সমকালের বলে অভিহিত করতে চান; তারা সত্যি পক্ষে নজরুল কাব্যের মর্মার্থ অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন নয়তো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ঈর্ষান্বিত হয়ে নেতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের একজন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ। তিনি এতটাই নজরুল বিদ্বেষী ছিলেন যে তিনি বলে বসলেন, 'রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জীবিতবস্থায়ই যদি নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে যুগাবতার বলিয়া ঘোষিত হন, তাহা হইলে সমাপ্তি হউক সাহিত্যের।' অথচ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কারাগারে অনশন ভাঙার জন্য তাকে (নজরুল) বলেন, 'বাংলা সাহিত্য তোমাকে চায়।' সজনী গংরা হিন্দু মুসলিম নজরুল বিদ্বেষী, একটি সরল সত্যকে স্বীকার করেন যে,

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব ছিন্ন করবে যে প্রবল প্রত্যয় সৃষ্টি করে দ্রোহী কাব্যভাষা নির্মাণে সফল ও সার্থক উদারতা নজরুলই প্রথম।

নজরুল কাব্যের এই স্বকীয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক আবু সায়ীদ আইয়ুব বলেছেন,

'Twenty Years ago Bengali poets were completely dominated by Rabindranath Tagore. They were thinking in his thoughts. Writing his language using his rhythms. About this time came Nazrul Islam, The mast instinctive of the Bengali poets, and stired up a new and virile individualism'

অথচ যারা নিজেদের অতিশয় বিদগ্ধ প্রাঞ্জল মনে করেন, এমন কতিপয় তথাকথিত সাহিত্যপ্রেমিরা এখন নজরুলের প্রতি নাক সিটকানো মানসিকতা পোষণ করেন; যা রীতিমত অশালীন, নিন্দনীয় ও কারো কাম্য নয়। তাদের কোনোক্রমেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বাংলা সাহিত্যে নজরুল এক অনন্য সাহিত্য স্রষ্টা ও সাহিত্য স্রষ্টা পুরুষ, বাংলা সাহিত্যের বাস্তব আখ্যান সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয় ও অতুল্য, ক্ষণজন্মা, এক মহান সাহিত্য স্রষ্টা বিশ্ব মানবের প্রতি তার যে অপরিসীম দরদ ও সংবেদনশীলতা তা বহুমাত্রিক, বহুজাতিক ও বন্ধুত্ববন্ধনে সমন্বয়ধর্মী। এ কারণে বিশিষ্ট কবি গীতিকার কামরুল ইসলাম তার 'কবিতার স্বদেশ ও বিশ্ব' গ্রন্থে বলেছেন– 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্থান একেবারেই আলাদা, তার কবিতার দ্রোহ মানবিক সংবেদ আবিষ্ট। তার ভুবনে তার সৃজনশীল প্রতিভার জল হাওয়ায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষেরই অবিচল বিচরণ। সচল জীবনের দিকে চলমান মোহ কাফেলা সেই যাত্রা নতুনের দিকে; সত্য ও সৌন্দর্যের দিকে। তার কবিতায় প্রেমবিরহ, আশা হতাশা, নির্যাতন-নিপীড়ন, শাসন-শোষণ, অনাচার অবিচার, যা সবই বিশ্ব সভ্যতার অনিবার্য উপাদানে উপকরণ। তারই প্রতিক্রিয়ায় তার কাব্য ও সাহিত্যে বিদ্রোহ বিপ্লব প্রতিবাদের ভাষায় হয়েছে শাণিত ও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় তা ঋজু ও পর্বতময়। যা অজর অমর ও অক্ষয় যশের অধিকারী। সুতরাং নজরুল তার কাব্যমর্ম সদা সর্বাঙ্গে সর্বকালের জন্য সামরিক; কিন্তু বহমান পুন পুন তা ফিরে আসবেই বিশ্ব মানবের মুক্তির হাতিয়াররূপে, বিশ্ব সভ্যতা রক্ষার নিয়ামক শক্তিরূপে। কবি সত্যিই বলেছেন তার বারবার ফিরে আসা সম্পর্কে;

'আমি যুগে যুগে, আসি আসিয়াছি পুন. মহাবিপ্লবহেতু
এই স্রষ্টার শনি, মহাকাল আমি ধূমকেতু।' (ধূমকেতু)

তার সমকালের হয়েই সর্বকালের হওয়া সম্পর্কে প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ড. করুণাময় গোস্বামীর 'নজরুল চর্চার নব যুগ' প্রবন্ধে বলেছেন,

'নজরুল সমকালের কবি মাত্র নন, তিনি চিরকালের কবি। চিরকাল সমকালের মধ্যেই নিহিত। নজরুল সমকালের মধ্যেই বিশ্ব মানবের স্পন্দনটি অনুভব করতে

সক্ষম হয়েছিলেন। নজরুল কাব্যের সাময়িকতার অভিযোগের জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবি কখনো সমকালকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর, বর্তমান বলে পৃথক করে নেয়া চলে এমন কোন কালপর্ব নেই।' নজরুলের নবযুগ আর টিএস ইলিয়টের ভাষায় 'The great poet, in writing himself, writes his time' সুতরাং নজরুল সকলকে ধারণ করেই কালান্তরিত হয়ে কালোত্তীর্ণ হয়েছেন। তার কবিতার ভাব বিদ্য ও চিত্রকল্প সমূহের এমন বোধ লগ্ন ও বাক্য এবং শব্দ ব্যবহারের নান্দনিক সমন্বয় সাধন করেছেন যার আবহ পাঠক চিত্তে অনির্বচনীয় এক সাসপেনশন অব ডিজবিলিভে সম্মোহিত হয়। তাই তার কবিতা এত পাঠক নন্দিত। তার বিদ্রোহী কবিতার সমন্বয়ী শিল্পশক্তি সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর অভিমত 'নতুন হোক পুরাতন হোক, দেশি হোক বিদেশি হোক শব্দের ধ্বনিতে ব্যবহারে তিনি (নজরুল) ছিলেন এক কুশলী কারিগর।'

নজরুলের বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে কোনো কথা বলতেন না। আসলে জলবায়ুর মতই কবির গতিবিধি ও বিচরণক্ষেত্র। সকল দেশ ও সকল কালে। তাদের কোন দেশ নেই, জাত নেই, জাতি নেই। পৃথিবীর সব দেশ, সব জাতিই তার। সাহিত্যসমালোচক মোতাহার হোসেন বলেন, কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবি সব দেশের সব কালের। তাকে জাতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা অত্যন্ত জবরদস্তি। মোট কথা এই চিন্তা চেতনায় তারা বৈশ্বিক। তবে নজরুল যে পটভূমিতে বৈশ্বিক মন-মানসিকতার আবহ অর্জন করেছিলেন, তা আলোচনার দাবী রাখে। যে অসামান্য জনপ্রিয়তা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার বিকাশ মূলত করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবনে। নৌকোরা, কোয়ার্টার জীবনে বিশ্ব সাহিত্যের বিরাট দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তার সামনে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের তাঁর কর্মকাল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার পাশাপাশি বিস্ময়কর শিল্পসৃষ্টির অপার সম্ভাবনা চলছিল। যেমন চলছিল বিশ্ব রাজনীতির উত্থান পতন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তা ১৯১৯ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। ইতোমধ্যে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে রাশিয়ায় মহামতি লেলিনের নেতৃত্বে মেহনতি শ্রমজীবী গণ মানুষের বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে তুরস্কর নতুন সুলতান হন মোহাম্মদ ওয়াহিলীন সিংহাসনে বসলে মিত্রবাহিনী তুরস্কের বিভিন্ন এলাকা দাদা নেলেস, সামসুন, আয়েন্তা আনাতলীয় রেলপথ দখলে নেয়। সুলতান তুর্কি সেনাবাহিনীর দুই প্রধানকে নব্য তুর্কি আন্দোলনের নেতৃবলে পদচ্যুত করেন। এতে তুরস্ক তার বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, প্রতিবেশী গ্রিকরা যখন আক্রমণ করে তখন তুরস্ক জেগে ওঠে। ১৯২০খ্রিস্টাব্দে তিন বৎসর তুরস্কে যুদ্ধ তুরস্ক শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। কিন্তু ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রিকরা আক্রমণ করলে এবং ২৪ জুলাই সাকারিয়া নদী তীরে গ্রিক বাহিনী তুর্কী বাহিনীর মুখোমুখি হলে প্রচণ্ড যুদ্ধে তুর্কী বিমান বাহিনীর সুনিপুণ সেনানায়ক জেনারেল মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে গ্রিক বাহিনী ২৪ আগস্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তুর্কী গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি বিজয়ী জেনারেল কামাল আতাতুর্ককে গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। এই পটভূমিতে নজরুল তার বিখ্যাত কামাল পাশা কবিতা রচনা করেন। তিনি তুর্কী বীর আনোয়ার পাশাকে নিয়েও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলোতে যুদ্ধের ভয়াবহতা জীবনমৃত্যু রক্ত শৈল্পিক চিত্র উপকরণ ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি হলেও বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন বিশেষ তাৎপর্যময়। তখন ইউরোপীয় সভ্যতায় এমন ধ্বংস নেমেছিলো যে তা ছিলো পুনর্জাগরণের অনুপযোগী। বিশ্ব যুদ্ধ মানুষের জীবন ধারাকে এমনভাবে বদলে দেয় যে, যদিও পূর্বে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো, তারই ধারাবাহিকতা অগ্রসর হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) পূর্বে ইংরেজ কবি টিএস ইলিয়ট, ইয়েটস, এজরা পাউন্ড আধুনিক মনন ও অনুভূতি স্থাপন করেন, যার উদ্ভব ফরাসি কাব্যের পরিবর্তন মুখে। এই ভিত্তি ভূমি পরবর্তী ত্রিশ বছর ইউরোপের সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের এক নব চেতনা উজ্জীবন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যে নবীন সাহিত্যিক কবিগণ কল্লোল, কালি ও কলম পত্রিকায় একটি কাব্য ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), করুণা নিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্র মোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৮৮), কুমুদ রঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), কালিদাস (১৮৮৯-১৯৭৫), প্রমথ চৌধুরী (১৮৪৮-১৯৪৬), মোহিত লাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) অন্যতম রবীন্দ্রনাথের শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪), বলাকা (১৯১৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), চৈতালী (১৯-১৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিটি কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলোতে প্রেম, প্রকৃতি ও ভাবের আবেশ জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্র কাব্যগুলো আধ্যাত্মিকতা ও তাত্ত্বিক দার্শনিকতা ভরা। রাতের খেয়া কবিতায় তাঁর উচ্চ কণ্ঠ ঘোষণা: শান্তি সত্য, শিবসত্য, চিরন্তন এ সকল কবিতায় দেবতার অপার মহিমা ঘোষণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবিতায় প্রেম ও যুদ্ধের ঘোষণা করলেন এভাবে- 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য' রবীন্দ্রনাথের রাতের খেয়া কবিতায় শুনি;

'দূর হতে কি শুনিস না মৃত্যুর গর্জনে, ওরে দীন
ওরে উদাসীন
ওরে ক্রন্দনের কলরোল
লক্ষ বক্ষ হতে রক্তের কল্লোল।'

রবীন্দ্রনাথের সহজাত মানসস্থায়ী হয়নি।

'বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতারও অশ্রুধারা
এর সমতুল্য সে কি হবে ধরায় ধুলায় হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন?'

পরাধীনতা, ধর্মীয় সামাজিক গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা অসামান্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বোপরি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আরেক প্রেরণার অপার সৃষ্টি বিদ্রোহী। এ কবিতায় নজরুল এতটাই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন যে, নিজপুত্রের নাম কৃষ্ণ মুহম্মদ (দুই ধর্মের অবতারের নামে)।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী কবিতা অগ্নিবীণা গ্রন্থের অন্তর্গত যে কবিতাটি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর রাত জেগে কবি লিখেন। পরে তা সাপ্তাহিক বিজলীতে ৬ জানুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর অসংখ্য সাপ্তাহিক ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে নজরুলের কবি খ্যাতির সাথে সাথে বিদ্রোহী কবি বিশেষণ যোগ হয়ে তার নামের অংশ হয়। কবিতা মূলত আমিত্বের সাথে আত্মজাগরণের উল্লাস দেখা যায়, তবে মানব ব্যক্তিত্বের সাথে একেকজন মানব সত্তা এক অতি মানবে পরিণত হয়। আত্মজাগরণের এই বিপুল ও বিচিত্র প্রকাশ শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, বিশ্বসাহিত্যে এক বিরল ঘটনা। বিদ্রোহী কবিতাটিতে যে জাগরণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সামাজিক- রাজনৈতিক ধর্মীয় পরিধি নিয়ে মানস রেনেসাঁস তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। যদি একটু লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই,

‘বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভুলোক দ্যুলোক-গোলক ভেদিয়া
উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।’ (বিদ্রোহী)

বস্তুত এই কবিতাটিতে নজরুল মানস ও জীবন এক বিচিত্র ধারায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নজরুলের সাথে হুইটম্যানের তুলনা করা হয়েছে। কবি রাজনৈতিক অস্থিরতা,সামাজিক অবক্ষয়, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, তুর্কি বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সমর্থন ও তাদের আত্মার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন এক দুর্বার অপ্রতিরোধ্য সংকল্প নিয়ে হাজির তার বিদ্রোহী কবিতা—

‘যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণকান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত’ (বিদ্রোহী)।

বিদ্রোহী কবিতা মূলত নজরুলের অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী চেতনা সমৃদ্ধ কবিতা। পৃথিবীর শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতার সর্বব্যাপক একটি অস্থিরতা, চাঞ্চল্যে, গণরোষ,গণ বিক্ষুব্ধতাকে নানা রূপক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় অসীম সাহসী নিঃসংশয় প্রতিবাদী ভাষার এক আমি বহুত্বে পরিণত হওয়ার একমাত্র উদাহরণ বিশ্ব সাহিত্যে।

সাহিত্যে রাজনীতির নবধারা প্রবর্তন করেন নজরুল তার অগ্নিবীণা কাব্যে ১৯২২ খ্রি.। যার একটি পরিভাষা আছে, আছে রাজনীতির গভীর যোগ সূত্র। বাংলা ভাষার নতুন বিন্যাসে নতুন এক ভাষারীতি যা প্রতিবাদের ভাষা, যা ভারতবাসীকে এক মোহনায় এনে দাঁড় করিয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, স্বপ্নহীন জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে পরিণত করেছেন। বিক্ষুব্ধ জাতি বিদ্রোহীতে পরিণত করে তাকে। বিপ্লবী প্রাণে উন্নত করার যে মূল মন্ত্রণা তা বিদ্রোহী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কোন কবিতায় আছে? তিনি ধরেছিলেন উপনিবেশ মুক্ত একটি স্বাধীন ভারতবর্ষ। তাই প্রধান হিন্দু মুসলিম জাতিকে একত্র করার প্রয়াস দেখা যায়। দুই জাতিকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে মুসলিম ঐতিহ্য ও হিন্দু পুরাণ-এর ঐতিহ্য সমান্তরালভাবে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। বিদ্রোহী কবিতার এই যে সমন্বয়ী রাজনীতি, যার একটি রাজনৈতিক পরিভাষা পেলো রাজনীতিবিদরা। তাই নজরুল কাব্যে বিশেষ করে বিদ্রোহীতে বিপ্লব এক অপরিহার্য উপাদান রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে সে উপাদান দেখতে না পেয়ে নজরুল বিক্ষুব্ধ হন রুষে উঠেন। বিদ্রোহী কবিতায় তাকে বলতে শোনা যায়

‘আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।
(বিদ্রোহী)

নজরুলের বিদ্রোহী আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে।

ব্রিটিশের অবিচার শোষণ নিপীড়নে অতিষ্ট ভারতবাসী বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। স্বাধীনতার জন্য যে আবেগ, উদ্দীপনা তৈরি হয় তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের (১৯০৬) জন্ম হয়, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অভিনব ভারত, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে অনুশীলন সমিতি, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের (১৮৮০-১৯৫৯) যুগান্তর সমিতি, তারকান হিসেবে (১৮৮৫-১৯৫৮) ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ড লীগ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১৮৮৯-১৯০৮), বিপ্লবী রাস বিহারী বসুর (১৮৮৬-১৯৪৫) নেতৃত্বে জাপানে সশস্ত্র উৎখাতে প্রচেষ্টা চালায়। এসবই বিদ্রোহীর এক প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতের রাজনীতির উপরে। নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা বলা যেতে পারে নজরুল কাব্য বিদ্রোহীকে। এই কবিতায় কবি নিজস্ব কাব্য সৃষ্টিতে অপূর্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সুরের যাদুকর প্রেমের অনুঘটক, সশস্ত্র বিপ্লবের কাণ্ডারী। মিথ্যা অনাচার অবিচারকে দু’পায়ে পিষ্ট করার এক দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন। যা কবিতার ছত্রে ছত্রে পরিদৃষ্ট হয়েছেঃ

‘আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল
আমি মানি নাকো কোন আইন
আমি ভরাতরী করি ভরা ডুবি, আমি টর্পেডো আমি ভাসমান মাইন।’
(বিদ্রোহী)

বিদ্রোহী কবিতায় বিশ্বের মানবমুক্তির যে ঘোষণা তা বারবার ঘোষিত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার বিজয় নিশান উড়াবার যে দৃঢ় প্রত্যয় ধ্বনিত

হয়েছে। সেখানে অত্যাচারী শাসক শোষক এমন কি দেবতার কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেন, আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।

আমি মানব দানব দেবতার ভয়, বিশ্বের আমি চির দুর্জয়ে জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরোষোত্তম সত্য, আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য। (বিদ্রোহী)

এই যে ভয়ডরহীন অন্যায় অসত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা, একটি কবিতা, একটি মানব মুক্তির ইশতেহার, স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল তার নাম বিদ্রোহী। এটি শুধু একটি মাত্র কবিতা নয়, এক আগুনের ফুলকি। যা জগতের সকল গণ মানুষের পুঁজিতে বেদনা নিরসনের এক অব্যর্থ মহা ঔষধ। আর এ কারণেই পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকা অমৃত বাজার সম্পাদক শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ বলেছিলেন, If Nazrul had written only his poem Bidrohi (rebel) he would have been Bamous' (২৫ জুন-১৯৬২ নজরুল জন্মদিন উদযাপন, কনওয়ে হল, কলকাতা, দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা কলকাতা)। বিশ্ব সাহিত্যে কত ভাষায় বিদ্রোহী অনূদিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে, অধ্যাপক বিনয় সরকার, আখতার হোসেন রায়পুরী, উইলিয়াম রাদিচি অন্যতম। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয় সরকার, বিদ্রোহী পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার অনুবাদ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। নজরুলের বিদ্রোহীতে তিনি নতুনত্বের ধ্বনি, বিশ্বছন্দের দোলা আর বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্রোহীর অনন্য শক্তিমত্তাকে। তিনি নজরুরের বিপ্লবী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিবিড়ভাবে। ২২ বছর বয়সী কোন কবির কবিতায় এমন নৃত্য পাগল ছন্দ ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দ দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার যেন কবিতাকে বাংলা ভাষার উপনিষদ। যা বাংলা ভাষার আগে পরিদৃষ্ট ছিলো না। অধ্যাপক বিনয় সরকার। Futurism of young Asia গ্রন্থে বিদ্রোহী কবিতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'আমি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পড়ে উপলব্ধি করলাম, বিগত ১০ বছর ধরে আমরা বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের প্রত্যাশী ছিলাম, আজ তারই সূচনা হলো। মনে হচ্ছে আমাদের সাহিত্যে জীবনের উত্তেজনার একটি সমুদ্র উছলিয়ে পড়েছে। মুসলমানরা স্বীয় মাতৃভাষার এতটুকু খেদমত করেনি, যতটুকু তাদের উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। এখন প্রতিষ্ঠিত সভ্য রূপ নিয়েছে বাংলার নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত করার দায়িত্ব কর্তব্য তারই স্কন্ধে এসে পড়ল।'

নজরুল বিনয় সহকারে বলেছিলেন,

'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী'। কবিতায় কবি সমসাময়িক কালের বললেও তিনি সমকালের প্রয়োজন মিটিয়ে মহাকালকে ধারণ করেছেন। আজো তাঁর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। নজরুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি কিন্তু তিনি নিজেই একটি নয় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছেন। আর তিনি হয়েছেন সাহিত্যের পুরো পাঠ্য বিষয়বস্তু। ফলে তিনি একদিকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বাঙালির জাতীয় কবি। যিনি তার সাহিত্যকর্মে অবদানের ফলে বিশ্ব মানবতার একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব সাহিত্যে তার প্রাসঙ্গিকতা দিন দিন কমছে না; বরং তা আরো বাড়ছে, বিদ্রোহী কবিতার আলোকদ্যুতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ হচ্ছে বিদ্রোহী চরিত্রই নজরুল। যার প্রভাব ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে তা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা শুধু হাল আমলে শুরু হয়নি। সারা পৃথিবীতে ব্যক্তির উত্থান সামষ্টিক মানুষের উত্থান শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে আর তা নজরুলই বলেছেন, সুতরাং তা হাল আমলেও প্রাসঙ্গিক। বিদ্রোহী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অন্যদিকে, টিএস ইলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড রচিত ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্রোহী অপরিমিত আবেগ ও অসামান্য সৃষ্টি কল্পনার প্রয়োগে রচিত আর ওয়েস্টল্যান্ড রচিত হয়েছে দীর্ঘ চিন্তাতে ও প্রজ্ঞার কুশলী প্রয়োগ।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে, কাব্য ছন্দে আমিত্বের দুর্বিনীত সাত যে সাহসী উচ্চারণ তা আমিত্বের মাঝ দিয়ে আবেগের নির্যাস নজরুলের কাব্য নির্মাণের ভেতর দিয়ে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে এসেছে। এতে করে শব্দ যাত্রা পথে ট্যাকচ্যুত হয়নি। নিজের শক্তি সাহসের কথা বলতে গিয়ে কখনও তা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি, অবনত হয়নি। কোন ভয় ভীতি তাকে সংকিত করতে পারেনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার হুংকার, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তার আমিত্বের মধ্য দিয়ে সমগ্রজাতির সাহস জাগিয়ে তোলার যে প্রয়াস তা প্রতীকি শব্দ ব্যবহারে বেপোরোয়া গতি লাভ করেছে। তাহলে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি অকুতোভয় এক সাহসী নজরুল বিদ্রোহী কবিতার শব্দ জোয়ার প্রবল বেগে যুগ যুগান্তরের নিপীড়িতের পক্ষে চৈত্রের দাবদাহ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই দাবদাহ মানবমনের শক্তি রূপে মোটিভেশনাল কোর্সকে চাঙ্গা করে সজীব করে অধিকারের কথাকে জানিয়ে দেয়। আমির এই সাহসই হলো দেহ ও মনের প্রাণ রসায়ন। মন স্তরের আলোকে কি বলতে পারি নজরুল কি সহিংস আতংকবাদী ছিলেন, এমন মোটেই বলা যাবে না। বরং ব্রিটিশ রাজ শাসক শোষক লাট বড়লাটকে তাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ প্রকাশ করেননি। বরং তার কাব্য ছন্দ ভাষা ব্যবহার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা ক্ষোভকে তিনি কবিতার নান্দনিক শব্দ দ্বন্দ্বের বাহনে বসিয়ে বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেছেন। যা আজো বিশ্ব কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়রূপে বিবেচিত হয়ে আছে। আর এ কারণে কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মতে,

ইমোশন বা মানসিক অবস্থার রূপান্তরিত ভাবই রস। আলংকারিকদের মতে, কাব্য নির্মাণ কৌশলের তিনটি ভাগ, বিভাগ, মাঞ্চারী, ভাব ও অনুভব। নব রস সৃষ্টি, নজরুল কাব্যে বীর রস প্রবলভাবে উপস্থিত। আমিই বীর রসের প্রধান উদাহরণ। আর বিদ্রোহী কবিতা জুড়ে রয়েছে বীর রস। বিভিন্ন কবিতায় প্রবল দেশ প্রেম থেকেও বীর রস পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকারের উপর নজরুলের ক্রোধ এতে করে রুদ্র রসেরও উপস্থিতি, পাশাপাশি বীভৎস রসের আধিক্য রয়েছে শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা থেকে নির্গত হয়েছে। মূলত নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে বীর রুদ্র

বীভৎসরসের উপস্থিতি বেশি রয়েছে। পরিশেষে বলতে পারি নজরুল কাব্য বিদ্রোহী বিশ্বসাহিত্যে আমি সর্বকালের সর্বযুগের বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত গণ মানুষের গণ চেতনার গণপ্রকাশ, কেবল আবেগের প্রবল বেগে তাকে উড়িয়ে দেননি তিনি, সে মানব মনের এক সৃষ্টিশীল কবি কল্পনা মেধা ও জীবনবোধে তা উজ্জ্বল, অনন্য, যা বাহুতে বিলীন হয়েছে, এ কারণেই শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্ব সাহিত্যে বিদ্রোহী কবিতা শিল্পগুণে অসাধারণ, শতবর্ষ পরেও প্রকম্পিত হয়েছে, যুগে যুগে কালে কালে সকল দেশের সকল সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত পরাধীন মানুষের মুক্তির মহা সনদ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকবে। আর বিদ্রোহী কাব্য বিশ্বসাহিত্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

নজরুলকাব্য বিদ্রোহী: নজরুল মানস

নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে তাঁর ব্যক্তি আত্মা কবি সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবিতাটিতে কবির ভাব ভাষা ছন্দ মেজাজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য,সকল কিছু মিলিয়ে নজরুলের মানস চেতনা ধরা পড়েছে। তাই সমালোচকগণ বিদ্রোহীকে নজরুলের কাব্যের মাঝে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

আজ কখনো মনে হয় নজরুল যত ইমোশনাল ততটা লজিক্যাল নন। রচনার পরিমিতিবোধ সম্পর্কে তিনি অনেকটাই অসতর্ক শিল্পীর স্বভাবসুলভ মাত্রা বজায় রেখে অনুভূতির বিকিরণের চাইতে তার উন্নত বিদীর্ণতটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশি। আর সেইখানেই তো নজরুলের পরিচয়। তা যদি না হতো, তাহলে ছন্দে ভাবে ভাষায় পরিপূর্ণতা এনে তিনি ওই বিপুলাকায় অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহী লিখতেন, লিখতেন রবীন্দ্রনাথের মত সংযত, পরিমিতি নিখুঁত নিপুণ স্বচ্ছন্দ্য যতি একটি ভাবগর্ভ চতুর্দশপদী আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আমি, নজরুল তা দেখেননি।
(সাহিত্য ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ)

নজরুল কাব্যের মানদণ্ড বিচারে যারা অন্ধভাবে এক পেশে ভাবে মন্তব্য করেন তাদের সম্পর্কে আবুল কালাম সামসুদ্দীন লিখেছিলেন, 'যুগ প্রবর্তক কবি প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম। অন্যান্য যুগ প্রবর্তক প্রতিভার উদয় যেমন হইয়াছে, নজরুল ইসলামের সময়েও তাহাই হইয়াছে। চতুর্দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিয়াছে। .... আমরা যতটুকু বুঝতে পারিয়াছি, তাহাতে বলতে পারি, নজরুল ইসলাম বেদনা সুন্দরের কবি। জগতের নিপীড়িত মানবতার ভিতরে বেদনার যে সার্বজনীনতা আছে, তাহার সুরেই নজরুল ইসলাম তাহার কাব্য বীণা বাধিয়াছেন। নজরুল কাব্যে বেদনার এই বিশ্বরূপ আছে বলিয়াই তাহার কাব্যকে আমরা বিশ্ব সাহিত্য বলিয়া অভিনন্দিত করি।' (কাব্য সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান; সওগাত-১৩৩৪)। নজরুল কাব্য সম্পর্কে বাংলা ভাষার আরেক গবেষক ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, সেই ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু তার ক্ষুদ্র নজরুল স্মৃতির সঙ্গে ক্ষুদ্রতর মন্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্রশংসাও নিন্দার কতিপয় অনর্গল বাক্য, তা আর পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করেননি আমৃত্যু। বরং তা কালের পুতুলের (১৯৬৫) একাধিক সংস্করণে তা অবিকল পুনর্মুদ্রণে অনেক বিভ্রান্তির উৎস হয়েছে।

গবেষক রফিক উল্লাহ খান লিখেছেন: আমাদের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পচেতনার আবহমান পটভূমিতে নজরুলের আবির্ভাব যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু যুগান্তকারী শৈল্পিক প্রয়াসের মধ্যেই নজরুলের আবেদন সীমাবদ্ধ, নজরুল পরবর্তীকালে কাব্য সমালোচকরা এ ধারণাকেই একটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়েছেন,

কখনো তাকে প্রতিভাবান বালক হিসেবে সনাক্ত করেন, আবার কখনো তাকে ইসলামী রেঁনেসার কবি হিসেবে খণ্ডিত বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি।'

পরাধীন ব্রিটিশ ভারতের শাসন শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন গণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের মুক্তির প্রয়াস, সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার এক বিক্ষুব্ধ অগ্নিবিস্ফোরক নজরুল কাব্য বিদ্রোহী।

সামাজিক অসাম্য-অসঙ্গতি ভণ্ডামী অবক্ষয় প্রভৃতি তাকে আহত করেছে। তিনি ছিলেন সত্য ও সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর। সামাজিক অন্যায় অবিচার, চিরন্তন মানবাত্মার অপমান তিনি সইতে পারেননি, তাই তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। মানবকল্যাণের আদর্শ ও গণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই যেন তার বিদ্রোহীর চেতনার মৌল প্রেরণা। বিদ্রোহী কবিতার বিদ্রোহীর স্বরূপ বুঝতে গেলে নজরুলের মন্তব্য জানা যাক। যে মন্তব্য তিনি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁকে লিখিত চিঠিতে করেছেন 'আমার বিদ্রোহী পড়ে যারা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তারা যে হাফিজ রুমীকে শ্রদ্ধা করেন, এও আমার মনে হয় না। আমিতো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাদের। বিদ্রোহীর জয় তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকে কলঙ্ক তিলক বলে ভুল করেছে কিন্তু আমি করিনি। মনে হয় আপনিও ভুল মানেটা নিয়েছেন। বেদনা সুন্দর গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেছিনু আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা কলুষিত পুরাতন পচা সেই মিথ্যা কলুষিত পুরাতন পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে রেখে তার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি এইতো আমার অপরাধ। এই জন্যইতো আমি বিদ্রোহী। আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি নিষেধের বেড়া অকুতোভয় ডিঙিয়ে গেছি এর দরকার ছিলো মনে করেই।' ইব্রাহিম খাঁকে পত্রের উত্তরে নজরুলের লেখা পত্র, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম লেখক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন- (পৃষ্ঠা: ১৪৮) নজরুল কাব্য বিদ্রোহী প্রকাশিত হবার পর জনপ্রিয়তায় হিমালয় চূড়ায় আসীন হয়েছে। কবিতার ভাষায় যেন আগুনের ফুলকি ছোটে। বিদ্রোহীর আলোক ধারায় আলোকিত হয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্য। কবিতার গতিবেগ জনতার হৃদয়ে ঝড় থেকে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়। সকল শোষণ নিপীড়ন দুঃশাসন অপশাসন সাম্রাজ্যবাদের- সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিবেককে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। গণসচেতনতায় সৃষ্টি করে জনমনে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে দ্রোহ। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে তাগিদ জাগায় জনগণের ঘরে ঘরে আর তাদের মনোময় জগতে। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের ভগ্নহৃদয়ে বাঁচার যে আকুতি মাথা উচু করে দাঁড়াবার যে প্রেরণা মূলত তাই নজরুলের বিদ্রোহী। দ্রোহ থেকে বিদ্রোহ যা এক থেকে একাধিক ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে রূপ নিয়ে মানব মনে এক বিপুল বিশাল রেনেসাঁসের সৃষ্টি করে আর কবির কপালে এনে দেয় বিদ্রোহী কবির উপাধির স্বর্ণমুকুট। যদিও বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর প্রেমিকসত্তাও প্রবল প্রখর উজ্জ্বলতা নিয়ে হাজির হয়েছে, যাকে অস্বীকার করা যায় না। কবি বলেছেন:

'আমি চির অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়, চিত- চুম্বন চোর কম্পন থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর। আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুখন। আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তাঁর কাঁকন চুড়ির কনকন।' কবি সত্তার মাঝে তাঁর প্রেমিক সত্তা (বিদ্রোহী) অনেকটাই ম্লান বলে মনে হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতার আকাশ সম জনপ্রিয়তা ও সাহিত্য মূল্য অনন্য শিল্পসত্তার প্রভাবে চাপে পড়ে গেলে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। কারণ একই সাথে তিনি রোমান্টিক প্রেমের কবিও বটে। তার অসংখ্য কবিতা গানে যার পরিচয় মেলে।

নজরুলের বিদ্রোহী মানস সত্তার স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে নজরুলের কৈশোর জীবনে ফিরে যেতে হবে। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে ময়মনসিংহ থেকে ফিরে নজরুল ১৯১৫, ১৬, ১৭ রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে তিন বছর পড়াশোনা করেন। প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রিয় শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সাথে কবির পরিচয় ঘটে। নিবারণ চন্দ্র ঘটক যুক্ত ছিলেন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতির সাথে। এই দুই সংগঠনই মনে করত সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতার আর কোন পথ খোলা নেই। নিবারণ চন্দ্র ঘটকের চিন্তা চেতনার প্রভাব কিশোর নজরুলের মনে প্রাণে স্থায়ী রাজনৈতিক সামাজিক বিপ্লবের চেতনার ছাপ রেখেছে বলে ধারণা করা যায়।

সেই কিশোর বয়সেই নজরুল কতটা দেশপ্রেমিক ও সাহসী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দর স্মৃতিচারণে 'নজরুল আর শৈল পাখি শিকার করতে এয়ারগান নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নজরুল কবরস্থানের দিকে গেল, গাছগাছালির দিকে বললেও সেদিকে পা বাড়ালো না দুখু। এগিয়ে গেলো কবরস্থানের দিকে। সারিসারি বেদির দিকে তাকিয়ে উল্লাসের আরো জোর বেড়ে গেলো। ইট বাঁধানো বেদীগুলোই দুখুর লক্ষস্থল বুঝতে পেরে শৈল কথা বলতে শুরু করল, পাখি না মেরে বেদীর দিকে বন্দুক তাক করছো কেন? দেখছো না বেদীর গায়ে পাথর খোদাই করা নেমপ্লেট বসানো, বলতে বলতে সে ফটাস ফটাস সীমার গুলি ছুড়তে লাগল, বড় লাট আর ছোট লাটের বেদীতে। চুনকাম করা বেদীর পলেস্তারা খসে যেতে লাগলো। বেদীর চেহারা বিকৃত করে জোর কদমে সে সামনে এগিয়ে চলল, দেখল, ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট আর এসডিওর কবর, সেখানে আক্রমণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শৈল বলল, এ কি করছো দুখু?

দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়ে গুলি ছুড়ছি। এগুলোতো ইট সুরকির দেয়াল। দেয়ালে গুলি ছুড়ে কি ইংরেজ মারা যায়?

মারার মহড়া দিচ্ছি, হাত পাকা করে নিচ্ছি, তুমিও চালাও। নাও বন্দুক। শৈল বলল, ওদের কি দোষ? বড় লাট ছোট লাট ওরাতো চাকরি করে। কর্মচারী কি, ওরা শোষক, ইংরেজ দোসর। দোসরদের ছাড়বো না আমরা। ইংরেজমাত্রই আমাদের শত্রু। ওদের না মারলে ইংরেজদের তাড়াতে পারবো না আমরা। অবাক হয়ে শৈল

তাকিয়ে রইলো দুখুর তেজোদীপ্ত মুখের দিকে। কোন কথা বলতে পারলো না সে। (কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিউএজ পাবলিশার্স লিমিটেড কলকাতা ২০০৮।)

নজরুল মানস বিশ্লেষণ করতে গেলে বিদ্রোহী কবিতার কিছু শব্দ বুঝতে হবে;
'বল বীর/ বল উন্নত মম শীর,
শির নেহারী আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।' (বিদ্রোহী)

আমি, বীর বল মম প্রভৃতি শব্দ বিদ্রোহী কবিতার ভেতর থেকে প্রাণ সঞ্চারী আবেগ, ভাবোচ্ছ্বাস, জোয়ার সৃষ্টি করে; যা ক্ষণস্থায়ী কোন ধ্বনির ফাঁকা বুলিমাত্র নয় তার স্থায়ী বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর মনে শতবর্ষেও পরম চরম আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শক্তি সঞ্চার করে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনোজগতে এক রুদ্রবাণীর ঝংকার তোলে। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীর বিরুদ্ধে তাঁর মানস লোক বিদ্রোহী কবিতার ছত্রে ছত্রে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ঝলমল করে হাসছে। তার বিদ্রোহী কবিতায় সমকালের ভারতবর্ষের মানুষের মনে যে চৈতন্যবাদী মাত্রা জাগিয়ে তোলার আহ্বান, তা সর্বকালের সর্বযুগের সকল সমাজের মানুষের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অত্যাচারী নিপীড়িত মানুষের মুক্তির এক মহামাত্র যে মন্ত্র বিশ্বজনীন মানবের।

বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল মানস খুঁজতে গেলে কবি আপন সত্তার ভেতরে নিপুণ হাতে করেছেন শব্দের প্রতীকি ব্যবহার। প্রতিটি শব্দের ভেতরে তা প্রাণ সঞ্চারী ভাবের বোধ জাগিয়ে বিদ্যুতগতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে দ্রোহে বিদ্রোহে। চিরন্তন মানবাত্মা জেগে উঠেছে সাহসী ব্যক্তিত্বের মহিমায়। এ কবিতার অনন্য সাহিত্য শিল্প বোধ নিয়ে মানব মনের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, যাকে বলে জোশ। বিদ্রোহীতে নজরুল মানস শত মৃত্যু থেকে যেন ফিনিক্স পাখির মত আবার, বারবার বিপ্লবী চেতনায়, উত্তর উত্তর মানব মনের আগ্নেয়গিরির অগ্নি লাভা নির্গত করে। যা মানুষ থেকে মানুষে প্রবল বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ ঘটিয়ে মনোজগতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শক্তি সাহস, দুরন্ত সাহস, যা থেকে গভীরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে এক অতিন্দ্রীয় জগতে নিয়ে যায়। তখন প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠেন অতি মানবীয় মানব সত্তার অধিকারী। তখন মানব শির হয়ে যায় হিমালয় চূড়া থেকেও উঁচু অজেয়- অমর অক্ষয় যাকে পরাজিত করা যায় না। কবি বলেন,

'আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়
আমি মানব দানব দেবতার ভয়, বিশ্বের আমি চির দুর্জয়
আমি জগদীশ্বর ঈশ্বর, আমি পুরোষোত্তম সত্য।' (বিদ্রোহী)

নজরুল মানসে আমিত্বের যে দুর্বার শক্তি বলে, আমিত্বের যে বোধন, তা ঠিক কি করে বেড়িয়েছে বিদ্রোহী কবিতায়। আমিত্বের দুর্বিনীত শক্তি, বীরত্বের যে সাহসী উচ্চারণ, যে অমিত বিক্রমতেজ তার শব্দ ব্যবহারে যে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভাষার কোন জড়তা নেই, আবেগের নেই কোন বাঁধ। কবিতায় যে গতিময়তা, ভাব সঞ্চারী আবেগ তা শুধু কিছু শব্দ সঞ্চার নয়, এ যে, প্রবল প্রতাপে মানব হৃদয়কে জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসিমের পানে।

'ছুটি ঝড়ের মত করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে।
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি,
দিয়া দিয়া লম্ফ আমি ত্রাস সঞ্চারী ভুবনে
সহসা সঞ্চারী ভূমিকম্প।' (বিদ্রোহী)

নজরুল বিদ্রোহীতে তার যে মানসলোক ধরা পড়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তৎকালীন ব্রিটিশশাসিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় যে অনিয়ম অবিচার নিপীড়নের চিত্র তা তার কাব্য ও সাহিত্যে উপজীব্য করেছেন সহজে। নজরুলের এই বৃহত্তম সমাজ ভাবনা, প্রতিবাদী সত্তা ধীরে ধীরে তার মনোময় জগতে বিকশিত হয়েছে। তা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংক্ষুব্ধ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে শৈল্পিক রূপায়নে। যা নানা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় স্ববেগে তাড়িত হয়েছে , বিক্ষুব্ধ আবেগ মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে বীর রসে, যা কবিতার আত্মার রস দ্রোহের আগুন। মহৎ কাব্য সাহিত্যের উপাদান হলো ইমোশন বা আবেগ তাড়িত ভাবরস। আর এই মহৎ সাহিত্য গুণে উদ্ভাসিত আমাদের প্রিয় কবি। রুদ্র রসের মাঝে থাকে ক্রোধ আর বীভৎস রসে থাকে ঘৃণা, যা বিদ্রোহী কবিতায় বর্তমান। নজরুল মানসে তার বিদ্রোহী যেন মুদ্রার ওপিঠ আর এপিঠ। এই কবিতায় কবির যে সমন্বয়ধর্মী মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তা অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল জাতির সম্প্রীতির ঐক্য কামনা করেছেন। তাই সকল জাতির মীথের অপূর্ব ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তার বিদ্রোহী কবিতায়।

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি,
আমি দেবশিশু আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট দাঁত দিয়া ছিড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল। (বিদ্রোহী)।

এখানে জিব্রাইল, দেবশিশুর সাবলীল ব্যবহার কবির সম্প্রীতির এক অনুপম শব্দ ব্যবহার তাঁকে করেছে মহিমান্বিত, মহৎ সাহিত্য গৌরব।

বিদ্রোহী মূলত রাজনৈতিক মনোবীক্ষণের কবিতা, আর রাজনীতির বাইরে সমাজ ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি কিছুই কল্পনা করা যায় না। তাই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের যে ধারণা, যে শোষণ নিপীড়ন অবিচার বঞ্চনার শিকার গণ মানুষের মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। যা নানা রূপক প্রতীকের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যেন সকল কিছু ভেঙে চুরমার করতে চান। কবির ভাষায়,

'আমি ভেঙে করি সব চুরমার/আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নির্মম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানি নাকো কোনো আইন
আমি ভরাতরী করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো, ভীম ভাসমান মাইন।'

তিনি কেন সকল আইন কানুন মানতে চান না, কেন সকল কিছু ভেঙে তছনছ করতে চান, কেন সব কিছু ডুবিয়ে দিতে চান! যে সমাজে মানুষের অধিকার রক্ষিত হয় না, যে সমাজে নিরন্নমানুষ গৃহহীন পথিক, ক্ষুধার অন্ন জুটে না, সেই শোষিত বঞ্চিত মানুষের বুকের মরম বেদনা, বুকের রক্ত ক্ষরণ কবিতার মূলসুর। তার মানসলোক সেই অধিকারহারা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় জোরালো কণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখা যায়,

'মহাবিদ্রোহী রণকান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না।' (বিদ্রোহী)

এ শুধু তার আবেগতাড়িত ভাষা শব্দ ব্যবহারের আস্ফালন মাত্র নয়; এ তার জীবনের মহান ব্রত, তার মনোবীক্ষণের এক আদর্শিক রূপ। ক্রোধ-ক্ষোভ-ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করার যে কাব্যিক সুষমা। স্বাতন্ত্র মহিমা রয়েছে, যাকে তিনি আমিত্বের মনোজগতের প্রাণশক্তি বা সঞ্জিবনী শক্তিরূপে জাগিয়ে তুলেছেন। যাকে মহাকাব্যিক রূপ, মহাজাগতিক রূপও বলা যেতে পারে। বিদ্রোহী কবিতায় কবির শব্দ জোয়ারের যে বেপরোয়া উদ্দাম উচ্ছ্বাস, ভেঙে পড়া জাতির মেরুদণ্ড আবার খাঁড়া করে দাঁড়াবার যে নতুন উদ্দীপনা তা অভূতপূর্ব এক বিস্ময়কর ঘটনা। আধুনিক বাংলা কবিতায় তার মত করে কোন কবি মনোবীক্ষণ জাগিয়ে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, আমাদের জানা নেই। শুধু বাঙলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যে আছে বলে আমরা জানি না। আমরা এখানেই অনন্য কবি প্রতিভাধর শিল্প কুশলী নজরুলের পরিচয় পাই। বিদ্রোহী কবিতায় আবেগের মধ্যে প্রেষণার অসাধারণ সমন্বয় শক্তি যা যে কোনো মানবসত্তাকেই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহযোগিতা করে নিয়ে যায়। তার স্বভাবজাত আবেগঘন মেধার গোপন ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে মানব মনোবীক্ষণে প্রখর সূর্যের মত সত্যি হয়ে প্রবেশ করে। বিদ্রোহী কবিতায় মানবকল্যাণের যে সচেতন প্রয়াস কবি মনোবীক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, যা সদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরীর মত, জেগে জেগে একটি জাতিকে পাহারা দেয়ার মত। যা তার কবিতায় স্পষ্ট থাকে, যাকে বলে সুরিয়ালিজম সাহিত্যে মহৎ একমতবাদ। তার বিদ্রোহী কবিতায় একস্তবকে।

'আমি উত্থান আমি পতন
আমি অচেতন চিত্তে চেতন,
আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী,
মানববিজয়ের কেতন।' (বিদ্রোহী)

অচেতন জাতির মন, যে সমাজ জেগে জেগে ঘুমায়, যে সমাজের মন মানুষকে জাগিয়ে তোলার যে প্রত্যয়দীপ্ত শৈল্পিক ঘোষণা, বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের যে চাওয়া তার সাথে বিদ্রোহীর আমির এক মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার যে দৃশ্যপট, একের মধ্যে বহুত্ব, বহুর মধ্যে এক এটিই মূলত বিদ্রোহীর সৃজন প্রতিভার মহাবিস্ময়। নজরুল গবেষক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন,

'সাহিত্য বিশ্লেষণের পরতে পরতে নজরুলের সৃজন প্রতিভার উল্লাস দেখার সুযোগ আমরা পাই। উল্লাসও একটি আবেগ; আর আগেই বলা হয়েছে সৃজন প্রতিভা মেধারই অঙ্গ উপাদান আর মেধা ও আবেগের মিলনে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি শিল্পগুণ ও বিশ্বজনীন উপযোগিতায় হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী, অনন্য, অসাধারণ, যুগোত্তীর্ণ কালজয়ী।'

(সৃষ্টিসুখের উল্লাস, কথা প্রকাশ-২০১৭, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)

বিদ্রোহী কবিতায় আমি কেবলই নজরুলের একক কোন সত্তা নয়; আমি বিশ্বের সকল দেশের, সকল কালের, সকল সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত গণমানুষকে সচেতন করে তাদের দুর্ভোগে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের টেনে তোলা- এককথায় জন সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দান করা। গণসমুদ্রের এই ঝড়ের মাঝে আশার বাণী সমৃদ্ধ জীবনবোধের যে সৃষ্টিশীল কবি কল্পনায় উজ্জ্বল, তা নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে উদগীরণ ঘটেছে সমানতালে, বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলের সাহিত্য মতবাদ যেমন প্রকাশিত, তেমনি তার মানসিক মতবাদও চরমভাবে উদ্ভাসিত। আর এ কারণে বিদ্রোহী কবিতার শিল্পগুণ ও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সর্বকালের নিপীড়িতের গণ মানুষের মুক্তির সনদ রূপেও বিবেচিত হবে। বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলের সমাজ মনোবীক্ষণ বা তাঁকে সমাজবিজ্ঞানীও বলতে হবে। সমাজ দর্শনে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি বা মানস চেতনা, শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব সাহিত্যে বিরল।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহীঃ মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে নিপীড়িত গণমানুষের মুক্তির মর্মবেদনা তার সংবেদনশীল কবি হৃদয়ে সহমর্মিতা ও আবেগের আলোড়ন সৃষ্টি করে। শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের হাহাকার তার চিত্তকে বেদনাবিদ্ধ করেছিলো। তাই স্বজাতি-স্বদেশের নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনাকে তিনি তার সাহিত্যকর্মের উপজীব্য বিষয় করেছেন। জাতীয় জাগরণ ও চেতনা সৃষ্টির এবং নিপীড়িত মানুষের জীবনে এর উত্থান-উদ্দীপনা জাগরণের সামাজিক মানবিক দায়িত্ববোধে উন্মুখ হয়ে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন নানা রূপক প্রতীকের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, বিদেশী কি দেশী শোষক শ্রেণিও বাদ যায়নি এই বিষয় নির্বাচনে। দেশের মানুষের ধর্ম দর্শন, ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্ধত্ব, কুসংস্কার ভণ্ডামী সকল কিছুই তার সাহিত্য কর্মে খুঁজে পাওয়া যায়। কেন না নজরুল স্বদেশ বলতে শুধু বাংলা না বরং সমগ্র উপমহাদেশকে বুঝেছেন। তাই উপমহাদেশকে বিদেশী শোষক সাম্রাজ্য মুক্ত করতে তার বিক্ষুব্ধ আবেগ অনুভূতিরও বিদ্রোহী চেতনা, মনোভাবের যেন শেষ নাই। কবি বলেন প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে,

‘এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির আমাদের।
দিয়া প্রহারেন ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা করিনা ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
রামা'দের গামা'দের।’ (আত্মশক্তি)

নজরুল বাঙালির আত্মশক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে, বাঙালির বাংলা সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে; সেদিন এক বাঙালি ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগে তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা স্বর্ণ শিখায় লিখিত। (বাঙালির বাংলা)

কাজেই বাঙালির তথা ভারতবাসীর যে প্রাণের দাবী, স্বাধীনতা, গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার, এ সকলই মূলত বিদ্রোহী শুধু একটি কবিতা সংকলন নয় মানব মুক্তির এক মহাকাব্য দলিল।

বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে যত আলোচনা সমালোচনা হয়েছে, পৃথিবীর কোন কবির কবিতা নিয়ে এতটা আলোচনা সমালোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে আলোচনা সমালোচনা যতটাই হয়েছে অবমূল্যায়নও কম হয়নি। তবে আলোচনা সমালোচনা যাই হোক, যার গুরুত্ব আছে বৈ কি, সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে বিষয় আলোচনার দাবী রাখে সে বিষয় বুঝতে হবে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে বিদ্রোহী কবিতা লেখা হয়েছে। প্রথম ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, পরে আরো পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হলে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার কবিখ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহী কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক কবি সাহিত্যিক সমালোচক নানাভাবে মন্তব্য করেছেনঃ

বিদ্রোহীর বজ্রকঠিন ভাষাশৈলী ও কারা-নাকারার শব্দের সুর ঝংকার সর্বব্যাপি যার প্রাণশক্তি; সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন, কৈশোরকালে আমি জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরুবার ইচ্ছেটাকে অন্যায় মনে হতো। যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্ত্র ভরা নেশা, তার বেলোয়ারী আওয়াজের যাদু তাও আমি জেনেছি। আর এ নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার। অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না, যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈচৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো। (সাহিত্যচর্চা-পৃষ্ঠাঃ ১৪৪)।

বিদ্রোহী কবিতার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন,

‘নজরুলের শক্তি মন্ত্র আহ্বান তাদের চিত্তে জাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছাড়িয়েছিলো, বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে নজরুল অতিশয় জনপ্রিয় কবিদের একজন ছিলেন, আর সেইখানেই তার সার্থকতা এবং অন্যদের আপেক্ষিক ব্যর্থতা।’ (নজরুল কাব্য সমালোচনার ধারা-সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী- বৈশাখ-১৩৭০ বাংলা, ঢাকা)।

বিদ্রোহী কবিতা সম্পর্কে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁকে লেখা এক চিঠিতে কবি বলেন,

‘আমার বিদ্রোহী পড়ে যারা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তারা যে হাফেজ রুমীকে শ্রদ্ধা করেন, এও আমার মনে হয় না। আমিতো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাদের। বিদ্রোহীর জয়তিলক আমার ললাটে অক্ষয় ছুয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক তিলক বলে ভুল করেছে। কিন্তু আমি করিনি। মনে হয় আপনিও বিদ্রোহের ভুল মানেটা নিয়েছেন। বেদনা সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই আমি সত্য সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা কলুষিত পুরাতন পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে রেখে, তার রূপার খাপের ঝকমকানি দেখাইনি এইত আমার অপরাধ। এই জন্যইতো আমি বিদ্রোহী।’

(সওগাত যুগে নজরুল, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন-পৃ.১৪৮) প্রখ্যাত কবি সমালোচক ছন্দবিদ কবি মোহিত লাল মজুমদার বিদ্রোহী প্রকাশের আগেই শাতিল আরব, কোরবাণী, খেয়াপাড়ের তরণী প্রভৃতি কবিতা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি: নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন

'বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে তাহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী, এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় তাহার ভাব ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাহাকে বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙালি পাঠক লেখক সাধারণের পক্ষ হইতে আমি এই সময়ের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।'

(মোসলেম ভারত- সম্পাদককে লেখা পত্র)।

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা যে সমকাল ও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টিও অতুলনীয় রচনা হিসেবে কীর্তিতে আলোচিত সমালোচিত তার আরো প্রমাণ তুলে ধরা যাবে কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়; 'বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রাণ যা কামনা করছিল, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী। তার নিখাদ নির্মোঘ আমাদের মনের মাঝে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো।

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর/তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নতুনের কেতন উড়ে কাল বোশেখির ঝড়।' (জয়ধ্বনি কর),

নতুনের কেতন উড়লো সত্য। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পসময়ের মধ্যে এত বড় খ্যাতি অন্য কোন কবি অর্জন করেননি।

(নজরুল ইসলাম- কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু)।

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী সম্পর্কে নজরুল রচনাবলীর সুদক্ষ সম্পাদক নজরুল গবেষক কবি আব্দুল কাদির লিখছেন, 'মাত্র দু বছর আগে যিনি লেখক মহলে দেখা দিয়েছেন, সেই বাইশ বছরের তরুণ কবির হাতে বিদ্রোহীর মত প্রাণবন্ত কবিতা বের হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পাঠকের শ্রবণে আনে বেগবতী স্রোতস্বিনীর উপলাহত, কলধ্বনি; কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহীতে রূপায়িত হয়েছে উদ্দাম প্রাণশক্তি, অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস। সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিদ্রোহী প্রথমে সাপ্তাহিক বিজলীতে ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো। যা পরবর্তীকালে প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, সাধনা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় সংকলিত হয়। উদ্বোধন, ইসলামে দর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা হয়ে সারাদেশে ও সকল মহলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবি শৈলেন কুমার মল্লিক বিদ্রোহীর সঙ্গে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা মুসলেম ভারতে বিদ্রোহী বীর নামে সুদীর্ঘ কবিতা লিখে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীর বিপরীত মেরু থেকে ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা সওগাতে কবি গোলাম মোস্তফা সেই একই ছন্দে লিখেন নিয়মিত।' (নজরুল পরিচিতি- পৃষ্ঠা. ১০-১১)

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী ব্যাপক আলোড়ন ও আলোচনার ঝড় তুলেছিলো সত্য; কিন্তু বিদ্রোহী রচনার আগেই তিনি বাঙলা কবিতায় সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, বিশেষ করে তার কোরবানী, মহররম, শাতিল আরব, খেয়াপাড়ের তরণী, ওমর ফারুক, কামাল পাশা, আনোয়ার, সিন্দু কবিতার জন্য। প্রখ্যাত কবি সমালোচক ছান্দসিক মোহিত লাল মজুমদার বলেন,

'মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত আশান্বিত করেছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এমন আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে তাহার প্রতিভা মঞ্জুরী ও শক্তিশালিনী, এককথায় সাাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে, তাহার মনোগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাহার ভাব ভাষা ও ছন্দ। আমি তাহাকে এই অবসরে বাঙলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।' নজরুলের বিদ্রোহী আধুনিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী আধুনিক নন্দনতত্ত্বের বিশারদগণ যতই বাংলা কবিতার জগতে স্বাগত জানাতে থাকেন; কিন্তু শনিগোষ্ঠীর বিশেষ করে কিছু দিন আগেই যে মোহিত লাল মজুমদার নজরুলকে বাংলা কবিতার আসরে স্বাগত জানালেন তিনি আবার কি বলেন।

'কাব্যে কোনও সমস্যা বা মনোস্তত্ত্বের দোহাই নেই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালোই জমিয়াছে। আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের বালক প্রতিভা কাব্য কাননে কামস্কটক বন মহুয়া কুঁড়ির চাষ আরম্ভ করিয়াছে মুস্কিল হইয়াছে এই যে, 'দুষ্টুখোকাও' বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে, তাহা নটেশের নৃত্য নয়। দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্ম্যের উল্লাস হিসেবেই তাহা উপভোগ্য। এহেন তরুণের নিতান্ত কুৎসিত।'

(সত্যসুন্দর দাস ছন্দ নামে মোহিত লাল মজুমদার, সাহিত্যের খোলশ, শনিবারের চিঠি কার্তিক, ১৩৩৪ বাংলা, কলকাতা।)

আর শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস বিদ্রোহী কবিতা ব্যাঙ্গ করে লিখেছিলেন ব্যাঙ কবিতা

'আমি ব্যাঙ/লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব বরষে বরষা আসিলে ডাকি ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
আমি ব্যাঙ/দুটোমাত্র ঠ্যাঙ। (ব্যাঙ)

সমালোচনা সাহিত্যের একটি রীতি প্রথা প্যারোডি; কিন্তু সজনী দাসদের রুচিহীন, হাস্যকর অমার্জিত প্যারোডি ক্ষমার অযোগ্য। সমালোচনার দ্বারাই সাহিত্যের সত্যিকার শিল্প সৌন্দর্য বিচার বিশ্লেষণ গঠনমূলক ভাষায় দৃশ্যমান হয়। আর এই ধরনের সমালোচনা শুধু হাস্যকর নয়; ক্ষুদ্রতারও পরিচায়ক বটে। কাব্য সমালোচনা

এবং কবিতার মূল্যায়নের পরিবর্তে স্বনামে বেনামে নজরুলকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আক্রমণ করাই সজনী কান্ত দাস, মোহিত লাল মজুমদার ও নিরোধ চৌধুরীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই নিয়ে উপরোক্ত আদ্রজাল ও অশালীন মন্তব্যকে ভাঙা কুলায় ফেলে দিয়ে নজরুলের বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্য বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কাছে জাগরণের মূলমন্ত্র হয়ে বিবেচিত হয়ে আছে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা সমকাল তথা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি ও অতুলনীয় রচনা হিসেবে কীর্তিত হয়ে আছে। নজরুল কাব্য বিদ্রোহীর আরেক অন্ধসমালোচক শনিগোষ্ঠীর শ্রীনিরোধচন্দ্র চৌধুরী শ্রী বলাহক নন্দী ছদ্মনামে সমালোচনা সাহিত্যের সকল রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 'যা বলা প্রয়োজন আর তা হলো; বাংলাদেশের বালক-বালিকারা যাহাকে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর, ঝড়, কপোতী অথবা একই রকম একটি দুর্বোধ্য নামে বিদ্রোহের অবতার বলিয়া ওজন করে, তাহাকেই এবং তাহার কবিতাকে টিকে বিদ্রোহ বাণীর প্রাজ্ঞ জন শঙ্খ বলা যায় তাহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরি না কেন.... আমি এটা, আমি সেটা, আমি জীবনের যত জীর্ণ, পরিত্যক্ত, আমি জোড়াতালি দেয়া জিনিস তাহারই ভগ্নাবশেষ। আমি ফাঁটা টর্পেডোর টুকরা, আমি সাইক্লোন আমি কৃষ্ণের বাঁশি, আমি অর্ফিয়ুসের বীণা, আমি চেঙ্গিস আমি ভীম ভাসমান মাইন, আমি বিধবার দীর্ঘশ্বাস, আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, ভগবান, বিদ্রোহীর মন কেমন জানি না, কিন্তু এমন খোছাচারী বাদশার এমন ভীরু পদানত কেরানী বা কে আছে যে ষোড়শীর তরুণীর গানের গুলবাগ শুভ্র গ্রীবার ওপর, সুকোমল বক্ষঃস্থলে দিনরাত লুটোপুটি খাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে? এতো বিদ্রোহ নয়; এ যে আত্মসমর্পণ।' (শনিবারের চিঠি- শ্রীনিরোধ চৌধুরী, কার্তিক ১৩৩৪ বাংলা)

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী নিয়ে যারা আলোচনা সমালোচনা করেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ নিন্দা আবার কেউ সঠিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাদের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় সুপ্রকাশিত হয়েছে যে, নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ শক্তিমান ও সৃষ্টিশীল কবি। তার বিদ্রোহী কবিতা অসাধারণ মৌলিকত্বে অতুলনীয় সৃষ্টি।

বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে যেমন সমালোচনা হয়েছে, তেমনি এর নন্দনতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। একালের সব্যসাচী কবি, সাহিত্যিক সমালোচক নজরুল গবেষক ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ বিদ্রোহী কবিতার মূল্যায়নে বলেছেন,

'নজরুল মানসে হিন্দু মুসলিম দ্বৈত ঐতিহ্যের অবস্থান দ্বন্দ্বমুখর না হয়ে যে পরস্পর সম্পূরক হয়েছে এটা উদ্ভট নয়, এক অপূর্ব গড়নেরই বিশিষ্টতা। এতে কৈশোরক লোক সংস্কৃতি অবগাহন করেছে মনে হয়, অফুরন্ত যে আদিমতা ও অন্ধকার এর মূল প্রোথিত তার প্রকৃতি নিঃসন্দেহে গ্রীক ধর্মচেতনা অনুসারে বলা যায় ডায়নোসীয়। অধীত বিদ্যার পটভূমি থেকে কিনা জানি না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একালীয়। গভীর শিল্পবোধে তিনি (নজরুল) কবিতার নির্মাণ উপলব্ধি করেছিলেন তা এই বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ এবং সম্ভবত তার মন্তব্য, হিংস্র নগ্ন বর্বরতা লেখার সময়ে তার স্মৃতিতে ছিলো মূলত তদানীন্তন বাংলা কাব্যে অপূর্ব সৃষ্টি বিদ্রোহী।

'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
আমি মহা ভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বির
আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।' (বিদ্রোহী)

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ আরো বলেন,

'আমি, স্বরূপ নজরুল নামক শ্যেন ব্যক্তি নয়; বরং এক বিশ্ব মানব আমি, যা প্রকৃত অর্থে সত্যের প্রতিভূ আর সেই জন্যই নন্দনতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এই একটি মাত্র কবিতা, এই একটি মাত্র কবিতাকে আমি বলবো, দৈব অনুপ্রাণিত (Inspired) বা প্রেলোনিক ধারণা সম্মত, আবার এরিস্টটলীয়ও বটে। কারণ এতে রয়েছে সহজ মানব প্রকৃতির অনুচিকীর্ষা- Instict of Imitation এবং ছন্দ ও সুষমাবোধ উদারন্ত ইতিহাস যা ঘটেছে এবং কাব্যে যা ঘটতে পারে তার মধ্যে সামঞ্জস্য। অনুপ্রাণিত স্বতঃউৎসারণ ও অনর্গলতা এই কবিতার একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলেও বিশেষ সুগঠিত কাঠামোর মধ্যে তাহা নিহিত। এই কাঠামো তার ভাষাবিন্যাস, যার মধ্যে সঠিক শব্দসম্ভার ভাবানুরূপ চিত্রকল্প ও স্তবক গঠন। এই বিশেষের ব্যাঞ্জনা ও ধ্বনি যে সামান্য Universal উত্তরণ, আমরা সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারি।' (নজরুল কাব্যের নন্দনতাত্ত্বিক পরিমাপ- ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা ষোড়শ সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি-১৯৯৪ মোহাম্মদ মাফুজ উল্লাহ সম্পাদিত)

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের পূর্বেই কবি মোহিত লাল সাথে সাথেই নতুন ভাব ভাষা ছন্দের জন্য প্রথম অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। অগ্নিবীণা কাব্য (১৯৯২) প্রকাশিত হলে এর আলোচনা প্রসঙ্গে যুগ প্রবর্তক কবি বলে প্রথমে তাঁকে অভিহিত করেন সাহিত্য সমালোচক আবুল কালাম সামসুদ্দীন। তিনি তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন-

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা (১৯২২) প্রকাশিত হয়। নজরুল মোসলেম ভারতে সমালোচনার জন্য এক কপি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। অগ্নিবীণার সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিলো। কাজেই মোসলেম ভারতে দুই কলাম ব্যাপি এর সমালোচনা বেরুলো। অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম সমালোচনা ছিলো এটাই। এরপরের সপ্তাহে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিজলীতে একাধিক আলোচনা প্রকাশিত হয়। মোসলেম ভারতের সমালোচনায় আমি নজরুলকে যুগপ্রবর্তক কবি বলে অভিহিত করেছিলাম। বলেছিলাম, আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে মাইকেল রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলামই তৃতীয় যুগ প্রবর্তক। (অতিতদিনের স্মৃতি- আবুল কালাম সামসুদ্দীন-১৯২২- কলকাতা)।

পরিশেষে বলতে চাই যে, নজরুল কাব্যে বিদ্রোহীর মূল্যায়ন যেমন হয়েছে তার অবমূল্যায়ন কম হয়নি। তবে নজরুল বিদ্বেষীদের সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে অপাক্তেয় অগ্রহণযোগ্য ও অমার্জনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। নজরুল কবি প্রতিভার স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি এবং অসাধারণ তার মৌলিকতা বিদ্রোহী কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু বিদ্রোহী কবিতা নয়, বাঙলা কবিতার সার্থক স্রষ্টা তিনি, বাঙালির নবজাগরণের যে চেতনা তা তার কবিতা গানেই পাওয়া যায়। এক কথায় বাঙালির দ্রোহের চেতনায় স্রষ্টা যুগ যুগান্তরের বিশ্ব মানবের মুক্তির চেতনার অভিসারী বিদ্রোহী শতবর্ষে দেদীপ্যমান ঔজ্জ্বল্যে ভরা কোন গ্লানি কাজ করেনি, মূল্যায়নের ঝুলিতে ভরপুর, বিশ্ব সাহিত্যের এক বিস্ময় বস্তুতে, নজরুল কাব্য বিদ্রোহীতে যে ব্যক্তি চেতনা, তা দেশমাতৃকা মুক্তির আকুলতায় ব্যাকুল, উদ্বেলিত। নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তায় উৎসারিত; যা মেহনতি গণ মানুষের মধ্যে সম বন্টনের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নজরুল কাব্যে চিরন্তন মানবাত্মার মুক্তির সুরই যেন ধ্বনিত হয়েছে এবং মানুষের অপমানে ব্যথিত। নজরুল কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাবও পরিপূর্ণ, দুই কবির মানসচেতনা জীবনোপলব্ধি সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাতন্ত্রধর্মী। অনেক সময় মনে হলেও যে নজরুল কাব্য রবীন্দ্র প্রভাবে প্রভাবিত; কিন্তু উভয় কবির জীবনবোধ ও প্রকাশভঙ্গি, ভাব-ভাষার পার্থক্য সহজেই অনুমেয়, যা আপন মহিমায় উজ্জ্বল। নজরুল রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও বিষয় ভাষা, ছন্দ, রূপক প্রতীকে উপমার ব্যবহার চিত্রকল্পের আধিক্যের ব্যবহারে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। হুইটম্যানের মাইসেলফ তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, তিনি নজরুলের মত তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি পাননি। গবেষক আবু তাহের মজুমদার লিখেছেন 'কিন্তু সমকালে এমারসন ছাড়া হুইটম্যানকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি বিদ্রোহী রচনার সাত বছরের মধ্যেই বিদ্রোহী কবির খেতাব এবং জাতীয় কবি হিসেবে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্টইলে আয়োজিত জনাকীর্ণ জাতীয় নাগরিক গণসংবর্ধনা বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।'

নজরুল কাব্য বিদ্রোহী: স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনা

কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশ ভাবনা ও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে তার বিদ্রোহী কবিতায়। কবিতাটিতে কবির আত্মপ্রকাশ জাগরণের পাশাপাশি গণজাগরণের যে মূলমন্ত্র আরোপ করা হয়েছে, তাতে কবির বিদ্রোহী মানস লোকের সচিত্র রূপ দেখা যায়। বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলকে নৈরাজ্যবাদী বলেও মনে হতে পারে। কারণ এ কবিতায় কবির নৈরাজ্যবাদী চরমরূপ ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ নিপীড়ন পুঁজিবাদের নিপীড়ন, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদী, সামন্তবাদী শোষণ, ধর্মের নামে নানা প্রকার কূপমণ্ডুকতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যা সহজ সরল অসহায় মানুষের বুকে নিপীড়নের জগদ্দল পাথর হয়ে বসে আছে। কবি তা দেখে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, বিদ্রোহী হয়েছেন। তিনি যে সত্য ন্যায় ও সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, যে সুরের মায়াজাল তাকে আচ্ছন্ন করেছিলো তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। কারণ চিরন্তন মানবাত্মার অপমান তিনি সহ্য করতে পারেননি। মানুষের করুণ ক্রন্দন, এক মরম বেদনা কান্নার অব্যক্ত ধ্বনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই কবি দেশবাসীর সাথে তাদের দুঃখ দারিদ্র্য না পাওয়ার বেদনার সাথে একাত্ম হয়ে তাদের আর্ত আকুলতাকে ভাব ভাষা ছন্দ দিয়ে কবিতা গান ও সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি শব্দ তার স্বপ্ন ভঙ্গজনিত সুতীব্র বেদনাবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে স্বদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। তিনি দেশের মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলেন সকল অপশাসনের বিরুদ্ধে। কবি হলেন দেশজ ভাবনায় বিদ্রোহী বীর।

নজরুল বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নিপীড়িত জনতার মর্মবেদনা তার সংবেদনশীল কবি হৃদয়কে আহত করেছে। তাই তিনি মুক্তিকামী জনতার মাঝে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হত্যাকাণ্ডের হুকুম দাতা জেনারেল ডায়ারের কুকীর্তি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। ভারতের ব্রিটিশ জালিম শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেশবাসীকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে বলেন। কবি বলেন, 'আমাদের হিন্দুস্থান যেমন কীর্তির শ্মশান বীরত্বের গোরস্থান, তেমনি আবার তাহার বুক অত্যাচার আততায়ীর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন। সেই সব আঘাতের কীর্তি স্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষের দুনিয়ার মুক্ত বুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যত কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের কিছুরই স্তম্ভ আমাদের চোখে শূলের মত বাজিতেছে। কিন্তু এই যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, সেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেলো কিন্তু সেই

সঙ্গে আমাদের দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। তাহাকে ভুলিব না আমাদের মুমূর্ষু জাতির চির সজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমন জল্লাদ কসাইয়ের আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা। ডায়ারের মূর্তি যেন ডথারের কমতি ভুলিতে না দেয়। এই যে নতুন করিয়া জাগরণ এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনায় আত্মসম্মান জাগাইয়া তোলা, ইহার মুলকে ডায়ার নজরুল এইভাবে অসন্তোষ বিদ্বেষ ঘৃণা ছড়াইয়া জাতিকে জাগরিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তার এই যে বিদ্রোহ শুধু কথার কথা নয়; তার চিন্তা চেতনা মনন ও আচরণে সর্বত্র। দুর্দিনের যাত্রী প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখা প্রবন্ধে নজরুলের বিক্ষুব্ধ চিত্তের বিদ্রোহী রূপ বিকাশ লাভ করেছে। মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা প্রবন্ধে নজরুল বলেন, একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা! দেখলে অমনি তোমার পূর্ব পুরুষের রক্ত মজ্জা অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত দেউল তাদের ঘরের মত ছুটে পড়েছে। তোমার চোখের সাত পুরু করে বাঁধা পর্দা খুলে গেছে। তিমির রাত্রি দিক চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে পায়ে গর্দানে বাঁধা শিকলে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বল দেখি বীর– 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা।' কবি আরো বলেন, স্বরাজ মানে কী? স্বরাজ মানে নিজেই রাজা যা সবাই রাজা আমি কারো অধীন নই, আমরা কারোর সিংহাসন বসা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোন ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে, নইলে নয়। নজরুল তার আমি সৈনিক প্রবন্ধের বৃটিশের বিরুদ্ধে উস্কানিতে অসন্তোষ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

'কিন্তু দেশ যেন চায় মহাপুরুষ নয়। দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালবাসায় আঘাত আছে বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে বিদ্রোহ করবে।' (আমি সৈনিক দুর্দিনের মন্ত্রী)

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, নজরুল বিদ্রোহের এই পর্বে তার কৈশোর জীবন, জগৎ সংসার সৈনিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করেছিলেন না। শৈশবে কবি পিতামাতা হারিয়ে তাদের স্নেহ ভালোবাসা বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র পীড়িত হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সত্য সুন্দর পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য লীলা তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকেছে কিন্তু কবি সেই সৌন্দর্যের রূপ সুধা আকণ্ঠ পান করতে পারেননি তিনি যখনই সুন্দরের বীণা হাতে নিমগ্নচিত্তে বাজাতে চেয়েছেন তখন এই পৃথিবীর জরা ব্যাধি দুঃখ কষ্ট অত্যাচার নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনা তাকে ব্যথিত করেছে তার স্বপ্নচারিতা ভঙ্গ করেছে। তখন কবি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন স্বদেশের সেই ভাবনায় কবি হাতের বাঁশি রেখে হাতে রণসাজ করে অস্ত্র তুলে নিবেন তখন বলতে বাধ্য হয়েছেন–

> 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাশরী
> আর হাতে রণতুর্য।' (বিদ্রোহী- অগ্নিবীণা)

পরাধীন দেশের গ্লানি তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ তাকে সমাজযোদ্ধা করেছে। তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে এদেশের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি মূল সমূলে উৎপাটন করা যায়। তাই বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। তার অস্থায়ী নিবাস হলো বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস; মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। ৩২ কলেজ স্ট্রিটে কলকাতার অফিসে শুধু কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকগণই যে আসতেন তা নয়, এখানে রাজনৈতিক, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সকলেই আসতেন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বাস্তব পরিবেশের ভিতর দিয়ে নজরুল তার রাজনৈতিক মনোজগতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সান্ধ্য নবযুগ পত্রিকায় কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ কাজী নজরুল ইসলাম যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন, যার প্রকাশক ও পরিচালক শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। নবযুগ পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী উপসম্পাদকীয় ও প্রবন্ধগুলি সরকারকে উমকে দিয়েছিলো। যার লেখাগুলির অধিকাংশই নজরুলের লেখা। নবযুগে লিখিত সম্পাদকীয় ও নিবন্ধগুলি যুগবাণী প্রবন্ধ সংকলনে ২৬ অক্টোবর/২২ প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রতিটি প্রবন্ধেই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা ও গণজাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে থাকে। নজরুল বলেন, আমরা ইহার মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লাহ হত্যার বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সাথে একদল মুহাজিরিনের গোলামাল হওয়ার কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে মুহাজিরিনের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিনবার গুলি বর্ষণ করে, তাহাতে নাকি মাত্র একজন নিহত একজন আহত হয়। কোন মূর্খ বিশ্বাস করিবে এ কথা? আমরা বলি একটি আঘাতের বদলে তিন তিন বার গুলি বর্ষণ করা এ কোন দেশের রীতি? তোমাদের তো সিপাহী সৈন্যের অভাব নাই বিশেষ করিয়া সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে তাহারা যদি সত্যি অন্যায় করিয়া থাকে সহজেই গ্রেপ্তার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি। নজরুল আরো বলেন, কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইবো না। আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেনো তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর আর আমাদের হাজার লোককে পাঠা কাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারি না? মনুষ্যত্বের বিবেকের আত্মসম্মানের স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি? গণমানুষের প্রতি কতটা (মুহাজেরিন হত্যার দাকে দরদ) গভীর ভালোবাসা তা উপরোক্ত প্রবন্ধে নজরুলের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল গবেষক নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'নজরুলের মুহাজেরিন হত্যার জন্য দায়ীকেও ধর্মঘট শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে গণ মানুষের প্রতি গভীর দরদ ও রুশ বিপ্লবের প্রণোদনা ছিল স্পষ্টতর।'

দেশের আপামর গণ মানুষের প্রতি তাদের অব্যক্ত বেদনার প্রতি তাদের ক্ষুধা দারিদ্র্যের প্রতি শোষণ নিপীড়ন তাকে চঞ্চল তাড়িত করেছে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। যে শাসক দেশের প্রজা সাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় উদাসীন থাকে, তাদের সে শাসনের প্রতি কবির কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, আস্থা নেই। তিনি সে আইন কোনভাবেই মানতে নারাজ, তার স্পষ্ট জবাব–

'আমি দলে যাই যত বন্ধন
নিয়ম কানুন শৃঙ্খল
আমি মানি না'ক কোন আইন।' (বিদ্রোহী)

যে আইন মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, বাক ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে, মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। দেশের মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে অচল করে মানবতার গ্লানিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সেই শাসন ব্যবস্থার অবসান কামনা করেন কবি। এজন্য যদি শত সহসা প্রাণ বন্দীত্ব বরণ করতে হয়, ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয় তাতে নজরুলের আপত্তি নেই, কবি তাদের বন্দনা গান গেয়ে বরণ করবেন বলে জানিয়েছেন বন্দনা গান কবিতায়।

'কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে, যাও তীরে বীর সংঘ হে।
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ অঙ্গ হে।
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারী
আমরা তাদের ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা গীতি তারই।'
(বন্দনা গান)

হিন্দু মুসলমানের ভাতৃত্ববোধ জাগরণের ভেতর দিয়ে পরাধীন ব্রিটিশ ভারতের যে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা তা অর্জনের লক্ষ্যে সমগ্র ভারতবাসীর ঐক্য সংহতি কামনা করা হয়েছে। এজন্য কারাবরণ শৃঙ্খলবেড়ি জুলুম নির্যাতন কোন কিছুই কবিকে দমাতে পারবে না। কারণ কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্য শিকল পরা শুধু একটি ছল। পৃথিবীতে প্রতিটি কাজের একটি বিনিময় মূল্য প্রয়োজন, আর ভারতের ত্রিশকোটি মানুষের মুক্তির জন্য কিছুদিন শিকল পরা বিনিময় মূল্যই বটে। কবির বন্দী জীবনের চিত্রও শাসক গোষ্ঠীকে তিরস্কার করে বলেন,

'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।'

অত্যাচারী শাসকের নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে এই শিকলকে কবি বিবেচনা করেছেন এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে তা বাস্তবায়নে সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করেন। নজরুল গণমানুষের অভাব দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য তাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদী ও তাদের দোসর এদেশীয় দালাল মুৎসুদ্দী শ্রেণি মহাজন সুদখোরদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন বলেই, তার সাহিত্যকর্মে কবিতা গান প্রবন্ধ কথা সাহিত্যে মানবমুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। তার কাব্য অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী এবং ভাঙ্গার গানে শোষক শ্রেণির অন্যায় অত্যাচার অবিচার জুলুম নির্যাতন ভেঙ্গেচুরে এক নতুন সমাজ, এক নতুন রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান নজরুলের। যে সমাজ হবে শ্রেণিহীন সর্বহারা মানুষের সমাজ। যে সমাজে অসহায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট, শ্রমজীবী, কৃষক, শ্রমিক মুটে মজুর তাঁতী জেলে গৃহহীন পথবাসী সর্বহারা শ্রেণির মরমবেদনার সুর, তাদের অধিকার আদায়ের আশার কথা বলা হয়েছে। কবি বলেন,

'আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস/হাহুতাশ আমি হুতাশীর
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী, চিরগৃহহারা যত পথিকের
আমি অবমানিতের মরম বেদনা
বিষজ্বলা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।' (বিদ্রোহী)

যে বিধবা মানুষ স্বামী সন্তান ও আপনজনের আদর ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে জীবন যাপন করছেন; তদুপরি অভাব জ্বরা ব্যাধি দুঃখ কষ্ট নিত্যসঙ্গী জীবন যেখানে স্থবির চলৎ শক্তিহীন জীবন স্মৃতি প্রায়। কবি সেই সকল অবমানিত গণমানুষের বুকে আশা ভরসা আস্থার প্রতীক পুনরায় হর শক্তিদানকারী এক অমিত বিক্রম তেজি মহা পুরুষ, উত্তম সত্য এক অদম্য আদর্শ। সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে কবি যে শ্রেণিহীন সমাজের কথা, সমকালীন আবহে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা করেছেন তাতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামন্তবাদী সমাজে গণ মানুষের অধিকার সাম্যবাদ বঞ্চিত মানুষ নিগৃহিত শোষিত বঞ্চিত নানাভাবে কবি যার অবসান কামনা করেন তবে সহজভাবে নয় একটি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই তা সম্ভব অন্যভাবে নয়। কবি বলেন, একটি শ্রেণিহীন সমাজের কথা সমাজ বিপ্লবের কথা।

'আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা সুধিতে হইবে ঋণ
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালিয়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা যে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়।
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মুটে, মজুর ও কুলি
তোমার বহিতে পবিত্র অঙ্গে যাহারা লাঙল ধুলি
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!'
(কুলি মজুর-সাম্যবাদী)

নজরুলের দেশপ্রেম ও স্বদেশ চেতনার খাদ নেই। সবটায় রয়েছে দেশজ ও মাটির গন্ধমাখা। তার সমস্ত রচনায় এই খাঁটি দেশপ্রেমের আবহ প্রভাব প্রকটভাবে চিত্রমল। দেশের মানুষ নদী নালা খাল বিল প্রকৃতি নিসর্গ কোন কিছুই বাদ যায় নি তার লেখা থেকে। তবে নতুন সমাজ নির্মাণের তার প্রলয়োল্লাস কবিতায় স্পষ্টতর, কবি বলেন,

'ঐ নূতনের কেতন উড়ে কাল বৈশাখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে এ নবীন জীবন হারা অসুন্দরের করতে ছেদন
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'
(প্রলয়োল্লাস)

কবিতার স্পিরিট সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ বলেন, '১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষিতে আমরা এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এ পকিল্পনায় ছিল। আমাদের পরিকল্পনা হতেই তৈরী হয়েছিল প্রলয়োল্লাস কবিতা সিন্ধু পাড়ের আগল ভাঙ্গা মানে রুশ বিপ্লব। জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভেতর দিয়েই আসছে নজরুলের নতুন, মানে আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব, এতো স্পষ্ট রাজনীতি।' এখানে বলতেই হয় অগ্নিবীণার বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, ভাঙ্গার গান, সাম্যবাদী, ফণিমনসা, পুবের হাওয়া, আমার কৈফিয়ত প্রভৃতি রচনায় তার দেশপ্রেম ও স্বদেশ ভাবনা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতাগুলো তার স্বদেশপ্রেমের সাথে সাথে সমাজ ভাঙার বিপ্লবী চেতনাও ভাস্বর হয়ে আছে। বিপ্লবী কবিতায় তার দেশাত্মবোধের সাথে সাথে তার মানব মুক্তি ও চেতনার সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছে গেছে। মানুষকে কত গভীরভাবে ভালোবাসলে বলা যায় মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান। কাজেই বিশ্বকে ভালোবাসতে হলে আগে নিজের দেশকে, জাতিকে ভালোবাসতে হবে, সেই ভালোবাসাই নজরুল সাহিত্যের মৌলসুর।

অগ্নিবীণা কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর পুরোটাই দেশজ ভাবনা ও রাজনৈতিক চেতনার অভিসারী। এ শুধুমাত্র কবিতা নয় যেন আগুনের সিম্ফনি, আগুনের হলকা, আত্ম জাগরণের মাঝে মানব জাগরণ তথা মুক্তির এক চরম পাঠ। এ পর্বে কখনো নৈরাজ্যবাদী দর্শনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

কিন্তু মানব উত্থানের চরম বিকাশ কাব্য বিচারের মৌল প্রেরণা। মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মায়; কিন্তু পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম তাকে নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তাই কবির কবিতায় নৈরাজ্যবাদীর ছায়াপথ দেখা যায়, আরবের বেদুঈন জাতির উপমা ব্যবহারে মুক্ত স্বাধীন জীবনের রূপকল্প বা চিত্রকল্প করেছেন কবি।

'আমি বেদুইন আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' (বিদ্রোহী)

মূলত পরাধীন ভারতের গ্লানি মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকে উজ্জীবিত ও তাড়িত করেছে। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতার দাবী উচ্চারণ করেছেন, স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক একজন মহারথি একেক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোচকা পুটলী বেধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবে না। তাদের অতটুকু বুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটাকে দূর করতে হবে।' এ সম্পর্কে কবি সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন, এই উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী এহেন অকুতোভয় ঘোষণার বাণী বাংলাদেশের এই মহাকবির কণ্ঠে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার জন্য যে গণসচেতনতা প্রয়োজন বা পূর্বশত তা নজরুল সাহিত্যের ফলে সে ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের জন্ম, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন দাবী, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজদ্রোহমূলক সভা ও সংবাদ দমন আইন, একই খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম প্রফুল্লচাকীর জজ হত্যা প্রয়াস, মানিক তলায় বোমা তৈরীর কারখানা স্থাপন বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী চেতনা, অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি, রাহাজানি, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন, ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, মন্টেগুচেমসফোর্ড রিপোর্টজাত অসন্তোষ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন শ্রমিক ধর্মঘট, মোপলা বিদ্রোহ, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রভূত ইন্ধন জুগিয়েছিল। এদিক থেকে নজরুলের ধূমকেতু ও বিদ্রোহী কবিতা গণচেতনার বিপ্লবী ভূমি কাপালন করেছিল। কারণ দেশবাসীর একমাত্র দাবী তখন ভারতের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি তথা পূর্ণ স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার জন্য কবি ব্রিটিশ শাসনের জেল জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন ভোগ করেছেন, তার কাব্যগ্রন্থ প্রবন্ধগ্রন্থগুলো রাজরোষের শিকার হয়েছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় এক ডজন গ্রন্থ। এ নিয়ে দৈনিক কাগজে প্রতিদিন খবর বেরিয়েছে। আনন্দ বাজার, অমৃত বাজার, সওগাত, ধূমকেতু, ছোলতান, আহলে হাদিস, মোসলেম ভারতসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে নজরুলের জেলজীবন অনশন, এমন কি তার সাজা ঘোষণার খবরও।

নজরুল এমন রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী ছিলেন যে, কারো ভয় ভীতি রক্ত চক্ষু শাসানী তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। জেলে বসেই তিনি দোলন চাঁপা (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩) যা আরবী মোক্তাদির ছন্দের আদলে লেখা রচনা করেছিলেন। এসবই তার পরাধীন ভারত মাতাকে মুক্ত করার জন্য তাই কবি দৃঢ় কণ্ঠে বিদ্রোহী কবিতায় উচ্চারণ করেন,

'আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।' (বিদ্রোহী)

এভাবে নজরুল ইসলাম সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন সদস্যপদ লাভ করেন। রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন– শ্রমিক প্রজা স্বরাজ পার্টি- The Labour swwraj party of the Indian National Congress ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর নজরুল গঠন করেন। এই দলের প্রথম ইস্তেহার নজরুল ইসলামের দস্তখতেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। যার অফিস ঠিকানা ছিল ৩৭ হ্যারিসন রোড-কোলকাতা। আর লাঙ্গল পত্রিকা ছিল এই দলের মুখপত্র। দলের আদর্শ ছিল 'নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পুন স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ লাভই এই দলের মূল উদ্দেশ্য।'

নজরুল রাজনীতিতে এতটাই মাতোয়ারা হলেন যে, সভাসমিতি, ভাষণ বক্তৃতা, সম্মেলনে গান লিখে তার সুরারোপ করে নিজেই পরিবেশন করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে অংশ নিবেন। তিনি অংশ নিলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী (বরিশাল জমিদার), আব্দুল হালিম গজনবী (দেলদুয়ার জমিদার), আব্দুল করিম (ঢাকা নবাব বাড়ি) ও মফিজ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ সামন্তবাদী ব্যক্তিবর্গের সাথে। নজরুল ইসলাম যত বড় কবি সাহিত্যিক হোন না কেন, তার যত নাম ডাক থাকুক সম্পদ ও অর্থ ছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেয়া তার বোকামী হয়েছিল। তিনি নির্বাচনে জামানত হেরেছিলেন। এক্ষেত্রে মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেন, কোন বড় জিনিস চেয়ে ব্যর্থ হওয়াতে কোন গ্লানি নেই। কারণ তিনি এ ব্যর্থতাকে জিন্দাবাদ বলে মনে করেন। তাই এ ব্যর্থতাকে রাজনৈতিক দর্শনের থেকে ব্যর্থতা দেখি না। বরঞ্চ রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল নতুন যুগের হাওয়া সবেগে বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে তা সত্যি বিরল। তাছাড়া নজরুল বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা তিনি সমাজবোধেরও প্রথম উদগাতা। শেষ কথা কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতিসত্তার কবি। তিনি বাংলা কবিতায় প্রথম সাম্যবাদের সুর, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এযাবৎ মধ্যবিত্তের চিন্তা চেতনার বদল ঘটিয়ে গণ মানুষের জয়গানে মুখর করেছিলেন, দীর্ঘকালের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য নিজের সাথে জড়িয়ে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তার জাগরণী চেতনায় কলমের মুখে ভাষা জুগিয়েছিলেন। তবুও তার সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে বাসনা যতদিন সর্বহারা মেহনতি মানুষের মুক্তি ও নিপীড়ন বন্ধ না হবে।

'মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে ধরিবে না।'
(বিদ্রোহী)

স্বদেশের তরে, গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাদের উপর শোষণ নিপীড়ন বন্ধে তার বিদ্রোহী সংগ্রামী চেতনা যা সর্বকালের বিশ্বের নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তি ও উত্থানের সাথে জড়িত। যুগে যুগে শোষক শ্রেণির হয়ত বদল হবে কিন্তু তাদের শোষণের রূপ পাল্টাবে না আর নিপীড়ন নির্যাতন থাকবেই, তখনই নজরুলের বিদ্রোহী সংগ্রামী চেতনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। ফিরে যেতে হবে নজরুল সাহিত্যের মানবচৈতন্যে নজরুল ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে বারবার তার দৃঢ় প্রত্যয়,–

'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহা বিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল আমি ধূমকেতু।'
(ধূমকেতু)

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের মুক্তি দেশের স্বাধীনতা তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় সকল ক্রান্তিকালে জাতীয় দুর্ভোগ নজরুলের সংগ্রামী ও বিদ্রোহী চেতনা আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। এই প্রেরণা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়; বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল।

সহায়ক তথ্যচিত্র:

০০১। নজরুল সাহিত্য-ড. রফিকুল ইসলাম।
০০২। সমকালে নজরুল ইসলাম - মুস্তফা নুরুল ইসলাম।
০০৩। নজরুল স্মারক গ্রন্থ-আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
০০৪। সওগাত যুগে নজরুল - মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
০০৫। নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা - মোহাম্মদ আবুল খায়ের।
০০৬। বাংলা সাহিত্যে নোবেল বঞ্চিত কবি নজরুল-চৌধুরী হাবিবুর রহমান।
০০৭। বহু মাত্রিক নজরুল-হাসান হাফিজ সম্পাদিত।
০০৮। আরবি কবিতায় ইসলামি ভাবধারা-ড. আব্দুল জলিল।
০০৯। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর-আবদুল মওদুদ।
০১০। নির্বাচিত নজরুল তিতাশ চৌধুরী।
০১১। নজরুল ও তার বৈরী পক্ষ্ আনোয়ারুল হক।
০১২। নজরুল সাহিত্য ও তৎকালীন বিশ্ব-ড. রিটা আশরাফ।
০১৩। নজরুল ও সাময়িক পত্র - মোবাশ্বের আলী।
০১৪। সার্বজনীন সংস্কৃতির বরপত্র নজরুল - আনু মাহমুদ।
০১৫। বিদ্রোহীও জাতীয় কবি নজরুল - মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ।
০১৬। কল্লোল যুগ্ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা-১৩৬।
০১৭। বাংলা সাহিত্যে নজরুল - আজহার উদ্দিন, কলিকাতা-১৩৬১।
০১৮। কবি নজরুল-আতাউর রহমান, ঢাকা-১৯৬৮।
০১৯। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র-আনিসুজ্জামান, ঢাকা-১৯৬৮।
০২০। নজরুল পরিক্রমা- আব্দুল আজিজ আল আমান, কলিকাতা-১৩৭৬।
০২১। নজরুল রচনা সম্ভার- আব্দুল কাদির, ঢাকা-১৯৬১ নজরুল রচনাবলী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ।
০২২। অতিত দিনের স্মৃতি- আবুল কালাম সামছুদ্দীন, ঢাকা-১৯৬৮।
০২৩। রেখাচিত্র - আবুল ফজল, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।
০২৪। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর আহমদ, ঢাকা-১৯৬৮।
০২৫। আমার শিল্পী জীবনের কথা, আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-১৯৬৫।
০২৬। নজরুল সঙ্গ প্রসঙ্গ কলিকাতা-কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত-১৩৮৩।
০২৭। নজরুল গীতি অন্বেষা-কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত-১৯৭৭।
০২৮। নজরুল প্রতিভা-কাজী আব্দুল ওদুদ কলিকাতা-১৯৪৯।
০২৯। নজরুল কাব্য পরিচিতি্ কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা-১৯৫৭।
০৩০। যুগস্রষ্টা নজরুল-খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, ঢাকা-১৯৫৭।
০৩১। পঁচিশ বছর-চৌধুরী সামসুর রহমান ঢাকা-১৯৫৮।
০৩২। ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়-জসিম উদ্দিন, কলিকাতা-১৩৬৮।
০৩৩। নজরুল মানস সমীক্ষা-জিএম হালিম সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৬৮।
০৩৪। শ্রদ্ধাস্পদেষু-নলিনীকান্ত সরকার, কলিকাতা-১৩৬৪।
০৩৫। চলমান জীবন, ২য় পর্ব্ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৩৬১। ০৩৬। আমি যাদের দেখেছি-পরিমল গোস্বামী, কলিকাতা-১৯৬৯।
০৩৭। নজরুল পরিচিতি-পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা-১৩৬৬।
০৩৮। বনস্পতির বৈঠক-প্রবোধ কুমার স্যান্নাল, ১ম পর্ব সমগ্র কলিকাতা-১৩৮০, ২ খণ্ড-১৩৮২।
০৩৯। কাজী নজরুল প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৯৫৫।
০৪০। নজরুল কাব্যগীতি বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন-বাঁধন সেন গুপ্ত, কলিকাতা-১৯৭৬।
০৪১। বিনয় সরকারের বৈঠক-১ম ভাগ, কলিকাতা-১৯৪৪।
০৪২। নজরুল কথা-কলিকাতা-১৯৭৩।
০৪৩। নজরুল স্মৃতি-বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত-১৯৭৩।
০৪৪। নজরুল সাহিত্য - মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত-ঢাকা-১৩৬৭ ।
০৪৫। নজরুল ইসলামের স্মৃতিকথা - মুজাফফর আহমদ, ঢাকা-১৯৭৬।
০৪৬। সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত-মোস্তফা নুরুল ইসলাম-১৯৬৯।
০৪৭। নজরুল ইসলাম - মুস্তফা নুরুল ইসলাম-১৯৭৭।
০৪৮। নজরুল প্রতিভা-মোবাশ্বের আলী, ঢাকা-১৯৬৯।
০৪৯। নজরুল সমীক্ষা-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঢাকা সম্পাদিত-১৩৭৯।
০৫০। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও বাংলাদেশ-রঘুবীর চক্রবর্তী-১৯৭২।
০৫১। নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা মোহাম্মদ মাহফুজ উদ্দিন, ঢাকা-১৯৬৩ ॥ ০৫২। চিঠিপত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা-১৩৪৯।
০৫৩। নজরুল নির্দেশিকা-রফিকুল ইসলাম, ঢাকা-১৯৬৯।
০৫৪। নজরুল কথা-শান্তিপদ সিংহ, কলিকাতা-১৯৭২।
০৫৫। নজরুলকে যেমন দেখেছি-শামসুন নাহার মাহমুদ, কলিকাতা-১৩৬৫ ।
০৫৬। নজরুল সাহিত্য বিচার-শাহাবুদ্দী আহমদ, ঢাকা-১৯৭৬।
০৫৭। কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে - শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,
০৫৮। আত্মস্মৃতি-সজনীকান্ত দাশ, কলিকাতা-১৩৮৪।
০৫৯। কবি নজরুল-সংস্কৃতি পরিষদ, কলিকাতা-১৯৫৭।
কলিকাতা- ১৯৬০
০৬০। নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়-সুফী জুলফিকার হায়দার, ঢাকা-১৯৬৯।
০৬১। নজরুল চরিত মানস-সুশীল কুমার গুপ্ত, কলিকাতা-১৩৭০।
০৬২। নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়-সৈয়দ আলী আশরাফ, ঢাকা-১৯৩৭। ০৬৩। নজরুল ইসলাম-সৈয়দ আলী হাহসান, ঢাকা-১৩৬১।
০৬৪। নজরুল নির্ঘন্ট-সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৭০।
০৬৫। যাত্রী-সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড), কলিকাতা-১৩৫৭।
০৬৬। তোমার সামরাজ্যে যুবরাজ- হায়াৎ মাসুদ ও জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, - ঢাকা-১৯৭৩ ।
০৬৭। যাদের দেখেছি – হেমেন্দ্র কুমার রায়, ২য় পর্ব-কলিকাতা-১৩৫৯।
০৬৮। নজরুল চর্চা- নারায়ণ চৌধুরী, ঢাকা-১৯৯০।
০৬৯। ইসলাম ও নজরুল ইসলাম - শাহাবুদ্দীন আহমদ, ঢাকা-১৯৮০ ।
০৭০। আমার জীবন কথা-আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, কলিকাতা-১৯৭৫ ।
০৭১। কাজী দার গানের স্মৃতি - আঙ্গুর বালা দেবী, কলিকাতা-১৯৭১ ।
০৭২। ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি-সুলতান মাহমুদ মজুমদার, কুমিল্লা-১৯৭৫ ।
০৭৩। স্মৃতিপটে নজরুল-কাজী মোতাহার হোসেন।

০৭৪। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক - বুদ্ধদেব বসু, বিশ্বভারতী-১৯৬৩।
০৭৫। বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ - কাজী নজরুল ইসলাম-১৩৩৪।
০৭৬। সাহিত্য সমীক্ষা- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ঢাকা-১৯৮৩।
০৭৭। আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল- নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, কলিকাতা-১৩৩৭।
০৭৮। রবীন্দ্র নজরুল সম্পর্ক - ড. রফিকুল ইসলাম।
০৭৯। নজরুল ইসলামের জীবন ও কবিতা - ড. রফিকুল ইসলাম।
০৮০। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল : পরস্পর সম্পর্ক - ড. সানজীদা খাতুন- ১৪০৯।
০৮১। বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা: প্রমথ চৌধুরী-১৩৩৪।
০৮২। বাংলা সাহিত্যে নজরুল - আজাহার উদ্দিন খান, কলিকাতা-১৩৮৫।
০৮৩। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা: ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল - আবুল ফজলপাশা।
০৮৪। সাহিত্যের দিগন্তঃ ত্রয়ী কবি: ১৩৯৫।
রায়বন মধুসুদন নজরুল আবু জোবের, ঢাকা-
০৮৫। নজরুলের সাংসারিক জীবন - মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা-১৯৮২।
০৮৬। কবি স্বীকৃতি ু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা-১৩৭৬।
০৮৭। কাজী নজরুল ও দীলিপ কুমার রায় স্মৃতি - বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলিকাতা-১৩৩৮।
০৮৮। কবি প্রনাম - কানন বালা দেবী, কলিকাতা-১৩৩৮।
০৮৯। নজরুল কাব্যের সাময়িকতা- কামরুল আহসান।
০৯০। নজরুল কাব্য পরিচয় - মধুসুদন বসু।
০৯১। নজরুল সাহিত্য বিচার-শাহাবুদ্দীন আহমদ ।
০৯২। কাজী নজরুল ইসলাম - প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ।
০৯৩। মুক্তির সন্ধানে ভারত-যোগেশ চন্দ্র আগল।
০৯৪। নব জাগরণের কবি নজরুল - নীতিশ বিশ্বাস।
০৯৫। সাংবাদিক নজরুল-জিয়াদ আলী।
০৯৬। কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা-সৈয়দ আলী আহমান ।
০৯৭। নজরুলের কথা সাহিত্য: মনোলোক ও শিল্পারু-আহমেদ মওলা।
০৯৮। নজরুলের নাটক নজরুল স্মারক গ্রন্থ- নীলিমা ইব্রাহিম।
০৯৯। বাংলা নটকে নজরুল তার গান নাচ ঘর - ব্রজ মোহন ঠাকুর-১৩৩৮।
১০০। নজরুল পদাঙ্গুলী ও বিবিধ প্রসঙ্গ-তৌহিদ হাসান।
১০১। নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি- আবুহেনা আব্দুল আউয়াল ।
১০২। নজরুলের উপন্যাস - শান্তি রঞ্জন ভৌমিক-১৯৯২।
১০৩। মৃত্যুক্ষধা ও কুহেলিকা: সমাজ ভাবনা- করুণাময় গোস্বামী-১৯৯৬।
১০4। নজরুলের আবির্ভাব- ইব্রাহিম খাঁ ।
১০৫। নজরুল ও রেনেসাঁস - মোতাহার হোসেন চৌধুরী।